

বুদ্ধমূর্তি : প্রসঙ্গকথা



সংঘরাজ অধ্যাপক ভিক্ষু সত্যপাল

বুদ্ধমূর্তি : প্রসঙ্গকথা

সঙ্ঘরাজ, অধ্যাপক, ড. ভিক্ষু সত্যপাল



বুদ্ধ ত্রি-রত্ন মিশন
নিউদিল্লি

গ্রন্থশীর্ষ বুদ্ধমূর্তি : প্রসঙ্গকথা
গ্রন্থকার সঙ্ঘরাজ, অধ্যাপক ভিক্ষু সত্যপাল
Title Buddha Murti : Prasangakatha
By Sangharaja, Prof. Bhikshu Satyapala
প্রথম সংস্করণ : ৫০০ কপি
প্রথম প্রকাশ প্রবারণা পূর্ণিমা ১৮/১০/২০১৩ ইং
রূপকার ও প্রচ্ছদ : Shri, Saurabh Jha
মুদ্রক নিউ গীতা প্রিন্টার্স, কোলকাতা-৭০০ ০০৯
কপিরাইট © গ্রন্থকার

গ্রন্থাকারের বাসস্থান (অস্থায়ী) :

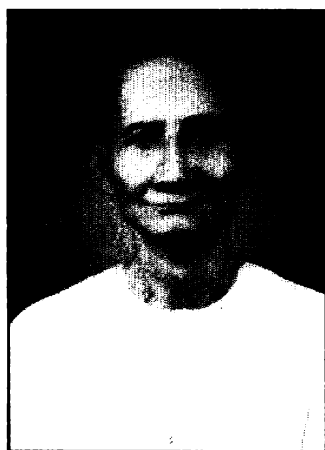
C-2/29-31, Chatra Marg
University of Delhi, New Delhi-110007.
Mob : 09968218648.
Email : bhikshusatyapala@live.com

প্রাপ্তিস্থান

Sumanapal Bhikkhu
Vidarshan Shiksha Kendra.
50T/1C, Pandit Dharmadhar Sarani,
Kolkata-700 015

Ven. Punyananda Sramaneri
(Dipu Barua)
South Mal Colony, PO. + PS. Mal Bazar,
Dist. Jalpaiguri (WB), Pin.
Mob. : 09832547643.

মূল্য : ৫০.০০



উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতা শ্রী বিপিনচন্দ্র বড়ুয়া ও মাতা শ্রীমতি চপলা বালা বড়ুয়া'র পুণ্য স্মৃতির কামনায় তাঁদের—

পুত্রগণ : শ্রী বিজয় কুমার বড়ুয়া, শ্রী বিনয় ভূষণ বড়ুয়া, শ্রী রানা বড়ুয়া
এবং শ্রী আদর্শ বড়ুয়া।

পুত্রবধূগণ : শ্রীমতি ছবি বড়ুয়া, শ্রীমতি নন্দিতা বড়ুয়া, শ্রীমতি টকি বড়ুয়া এবং
অনিমা বড়ুয়া।

প্রপুত্রগণ : শ্রীযুক্ত বিকাশ বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত বিভাস বড়ুয়া, শ্রী মিঠুন বড়ুয়া।

প্রপুত্রীগণ : শ্রীমতি শিখা বড়ুয়া, শ্রীমতি উষা বড়ুয়া।

প্রপুত্রবধূ : অর্পিতা বড়ুয়া

প্রপোত্রী : অনবী বড়ুয়া (বহিঃশিখা)

Kalinagar (North Purangar) The Satkania,
P.O. Purangar, Chittagong, Bangladesh.

Shri Binay Bhusan Barua

Garia Panchanan Sarkar Road, P.O. Rabindra Nagar
Dum Dum Canttonment Kolkata-65, INDIA

পুরোবাক

অজানা কোন শিল্পী প্রথম বুদ্ধমূর্তি করেছিলেন তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে শুধু নয় বিধুবজনেরা আজও অবধি অনিশ্চিত। অথচ ভারতবর্ষের আর্কিওলজিক্যাল প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনেক বুদ্ধমূর্তি নানা স্থান থেকে পুনরুদ্ধার করেছেন। সেগুলির প্রমাণ-পরিমাপ সর্বত্র এক নয়।

সঙ্ঘরাজ অধ্যাপক ভদন্ত ভিক্ষু সত্যপাল সেইসব বিষয় গৌণ বলে ধরেছেন। তাঁর অস্বীয়া অভিনব। “বুদ্ধমূর্তি : প্রসঙ্গকথা” এক অপরিচিত দিগন্তের সন্ধান দেয়। যখন গৌতম বুদ্ধ এই ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখন তাঁকে শ্রদ্ধাশীলেরা দেবতার মহিমায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। সেই সময় ক্যামেরা ছিল না, মোবাইলের স্নাপ-সট ছিল না। যাঁদের কাছে গৌতম বুদ্ধ ছিলেন প্রমাণ-পুরুষ, তাঁদের কাছে মূর্তিশিল্প অজানা ছিল না। হরপ্পা-মহেঞ্জদাড়ো উৎখননের পর প্রমাণিত হয়েছে যে ভারতবর্ষের মানুষেরা মূর্তি গড়তে পারতো। কুশলী ভাস্করেরা সেই যুগেও ছিল। হয়তো তাদের নাম-খাম জানা যায় না। তবে তাদের শিল্পকুশলতার নান্দনিকতার অভাব ছিল না।

সেদিক থেকে গ্রন্থের নামকরণটি যথার্থ করার জন্যে পূজনীয় সঙ্ঘরাজ শাক্যবংশের সিদ্ধার্থ তথা সবার্থসিদ্ধ কেমন করে গৌতম বুদ্ধ তথা ভগবান বুদ্ধ হয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শাক্যপুত্র গৌতম বুদ্ধের কোন নির্ভরযোগ্য জীবন কথা নেই। পশ্চিমী বিদ্বানেরা বলেন,— ‘লেজেভন্স অফ বুদ্ধ’ বুদ্ধের জীবনের গল্প-কাহিনী ঐতিহাসিকতার প্রশ্ন নেই। অনেকটা দস্তকথা; লোকমুখের গল্পো।

জাতকের নিদানকথা পালি ভাষায় লেখা। অনেকটা যেন জাতকের বোধিসত্ত্বের বিধির ঘটনায় উত্তরোত্তর বোধিলাভের পথে ক্রমিক উত্তরণের ভূমিকা অতশত জীবন পার হয়ে বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ শেষে শাক্যকুলের জাতক হয়ে তাঁর পরাকাষ্ঠা পেয়েছিলেন উরুবেলায় নিরঞ্জনা নদীতটে বোধিবৃক্ষের তলে বোধিজ্ঞান লাভ করে। সুবিদ্বান গ্রন্থকার কেবলমাত্র নিদানকথার উপর শাক্যমুনি বুদ্ধের চরমভাবিক অবৈবর্তিক বোধিসত্ত্বের প্রাক্‌বুদ্ধ জীবন-কথা সুত্ত পিটকের সুত্ত আটানাটিয়-সুত্ত, বোধিরাজকুমার-সুত্ত, মহাপরিনিব্বান-সুত্ত, মহাসতিপট্টান-সুত্ত এবং বিনয় পিটকের পব্বজ্জা-সুত্ত সুত্তনিপাত থেকে সঙ্কলন করেছেন। আরও অটুটকথা অর্থাৎ সুত্ত ও বিনয়পিটক গুলোর অর্থকথা বা টীকা গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-সম্ভার বাংলা-ভাষাভাষী সবার জন্যে আহরণ করে দিয়েছেন। তার ফলে বাংলাভাষায় একটি তথ্যস্বাক্ষর গৌতম বুদ্ধের জীবনকথা সুষ্ঠুভাবে রচিত হয়েছে। একথা অবশ্য স্বীকার্য।

ভদ্রস্তু ভিক্ষু সত্যপাল একজন কুশলী পালিভাষার বৈয়াকরণ। তিনি ব্যাকরণ-শাস্ত্রে কুশলী হয়েও উদ্দেশ্য ও বিধেয় প্রয়োগে একটা বিশেষ নিপুণতা দেখিয়েছেন। সাধারণ ক্রমে উদ্দেশ্য আগে বিধেয় পরে বসে একটি বাক্য রচনার ক্ষেত্রে। বুদ্ধমূর্তি : প্রসঙ্গ-কথা বলতে গিয়ে বুদ্ধের মূর্তি রচনার প্রাসঙ্গিকতায় মূর্তি বিষয় আলোচনা সম্পাদন করে বুদ্ধ প্রসঙ্গকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ বৌদ্ধ চারুকলায় মূর্তির নান্দনিক প্রসঙ্গকে প্রাধান্য না দিয়ে গৌতম বুদ্ধ কেমন করে শ্রদ্ধাবান বৌদ্ধদের কাছে আইকন (Icon) হলেন, সেই যুক্তি আগে উপস্থাপন করেছেন। সচেতন হয়েই গ্রন্থকার বৌদ্ধ শিল্পকলার আইকনিক আর্ট (Iconic Art) ও নন-আইকনিক আর্ট ((non-Iconic Art) প্রসঙ্গে তোলার অবকাশ রাখেন। বুদ্ধ প্রতিমা না থাকলে তাঁর আঙ্গিক চক্র ভিন্ন অরযুক্ত বোধিচক্র, মৃগলঞ্জনচক্র, ধর্মচক্র ইত্যাদির মর্যাদা কোথায় প্রয়োগান্তরে সামান্য বৌদ্ধকলা বিশারদের কাছে এক নতুন বার্তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ধন্য লেখকের প্রয়োগ-বিজ্ঞান।

আশা রাখি বাংলা-ভাষাভাষী সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু সত্যপালের অসামান্য রচনাইলীকে স্বাগত অভিনন্দন জানাবেন। গতানুগতিক বুদ্ধমূর্তি বিষয়ক গ্রন্থের থেকে এই “বুদ্ধমূর্তি : প্রসঙ্গকথা” বৌদ্ধ মূর্তিকলার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে এক নতুন বার্তা বয়ে আনতে পারে। চীবরধারী ভক্তকে প্রণাম।

শান্তিনিকেতন

গুরুা দ্বিতীয়া

১২/০২/২০১৩

অধ্যাপক, সুনীতি কুমার পাঠক

প্রসঙ্গকথা

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের Semester Break এবার ১৬/১২/২০১২ থেকে হবে নির্ধারিত থাকায় আগে থেকেই পরিকল্পনা ছিলো ছুটিটা Myanmar-এ কাটাবো। Yangon (পূর্ব Rangoon)-এ সরকার সঞ্চালিত International Theravada Buddhist Missionary University-তে এক Ph.D. Degree প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষার External Expert হিসেবে নিযুক্তিপত্র বহুপূর্বেই পেয়েছিলেন। তাই ১৪ই ডিসেম্বর ১০১২ (ইং) মধ্যরাতে বিমানযোগে মায়ানমার যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিলাম।

হঠাৎ ১২ই ডিসেম্বর, ২০১২ ইং তারিখে ‘শান্তিনিকেতন ড. আশ্বেদকর বুদ্ধিস্ট ওয়েলফেয়ার মিশন’-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সঞ্চালক আয়ুত্মান শ্রীমৎ বিনয়শ্রী মহাস্থবির মহোদয়ের একটি Phone Call আসে। তিনি জানান আগামী ৭ই এপ্রিল, ২০১৩ইং তারিখ তাঁর মিশনের উদ্যোগে সম্প্রতি নির্মিত (বেদীসহ) ৩৪ ফুট উঁচু বুদ্ধমূর্তির অনাবরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সাথে অনুরোধ করেন ঐ উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিতব্য মিশনের মুখপত্র ‘বোধিরশ্মি’র বিশেষ স্মারক-সংখ্যার জন্যে ‘বুদ্ধমূর্তি প্রসঙ্গকথা’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখার। কেন জানি না সাথে সাথেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্মতি দিয়ে ফেলি।

পরিকল্পনা মতে Yangon International Airport-এ। সরকারী অতিথি হওয়ায় স্বাগত জানানোর পরম্পরাগত ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। University Geust House-এ আমার আহার-বিহারের সব ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। ১৯শে ডিসেম্বর ২০১২ ইং মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। ঐ সময়েই ২১ ডিসেম্বর তারিখে ঐ ইউনিভারসিটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিতব্য “International Conference on Buddhist Meditation Practice in Myanmar and Various Methods” বিষয়ক এক ত্রি-দিবসীয় সম্মেলনের প্রথম পর্বের Moderator হবার আমন্ত্রণ পেয়ে তাতেও অংশ গ্রহণ করি।

Yangoon পৌঁছার দ্বিতীয় দিন (১৬/১২/২০১০ ইং) থেমে বুদ্ধমূর্তি : প্রসঙ্গ কথা’ শীর্ষক প্রবন্ধ লেখার পরিকল্পনা শুরু করি। তার পরদিন লেখা আরম্ভ করি। এর মধ্যে শারীরিক সমস্যা দেখা দেওয়ায় আমাকে চিকিৎসাধীন হতে হয়। তা সত্ত্বেও প্রবন্ধ লেখার কাজ ছাড়ি নি। ২০/১২/১০১২ ইং তারিখেই প্রবন্ধের রূপরেখা তৈরি হয়ে যায়।

এদিকে কিছু অপ্রত্যাশিত কারণে দিল্লি ফিরে আসার পূর্ব পরিকল্পিত তারিখ ০১/০১/২০১৩ ইং বদল করে ২২/১২/২০১০ইং তারিখ করতে হয়। ঐদিন মধ্যরাতে দিল্লি ফিরে আসি। ঐ সাত দিন অবস্থান কালকে যাঁরা সুখদায়ক করেছিলেন তাঁদের

মধ্যে Ven. Dr. U. Adiccavamsa, Ven. U. Varasami, Ven. Dr. Ottarayana
এবং Ven. Dr. U. Kumarabhivamsa-এর সহযোগিতা সৰ্ব্বতঃসংগতিতে স্বরণ করি।

মানুষ মাত্রেরই ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে। বিশেষত মানুষ নিজের পিঠ দেখতে পায় না। তাই এ লেখার ভাষা ও বিষয়বস্তু সংক্রান্ত নানা ত্রুটি প্রমাদবশে থাকতেই পারে। তাই প্রতিবারকার ন্যায় একবারও বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণ অধ্যাপক সুনীতি পাঠক মহোদয়কে অনুরোধ করেছিলাম এ প্রবন্ধটিকে ত্রুটিমুক্ত করার। তিনি শত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমার অনুরোধ রক্ষা করেছেন। তিনি শুধু ত্রুটিমুক্তই করেন নি, যথেষ্ট কলম চালিয়ে এটিকে বিজ্ঞ সাহিত্যপ্রেমীদের উপাদেয়ও করেছেন। তাঁর এ অমূল্য যোগদানের জন্যে আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো। তাঁর মঙ্গলময় ও দীর্ঘজীবন কামনা করি।

দিল্লি ফিরে এসে ঐ প্রবন্ধকে আবার নতুনভাবে লিখি। এর পর আয়ুত্থান কচ্চায়ন ভিক্ষুকে পুস্তকাকারে ছাপানোর যোগ্য করে দেবার অনুরোধ করলে ঐ দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। আমার লেখাকে আবশ্যিক নানা অঙ্গে সমলংকৃত করে এবং নিজে কয়েকবার কম্পোজিং করার কষ্ট স্বীকার করে বর্তমান আকারে পরিবেশনযোগ্য করে দেন। তজ্জন্য তাকে অশেষ আশীর্বাদ জানাই। এবং বুদ্ধমূর্তি প্রসঙ্গকথা লেখাটি বই আকারে প্রকাশ করার জন্য ড. সুমনপাল ভিক্ষু ও শুভবোধি ভিক্ষুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাড়াহুড়োর লেখাটি এত তাড়াতাড়ি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে দেখে আনন্দের শেষ নেই।

আশা করি পাঠকসমাজে এটি সমাদৃত হবে।

॥ চিরং তিষ্ঠতু বুদ্ধসাসনং ॥

তিথি : প্রবারণা পূর্ণিমা

ভিক্ষু সত্যপাল

তারিখ : ১৮ই অক্টোবর, ২০১৩ ইং

স্থান : নতুন দিল্লী

প্রকাশকের কথা

ভারতবর্ষের মাটিতে গৌতমবুদ্ধের জন্ম এবং তাঁর সংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বুদ্ধের বহুজন হিতায়-বহুজন সুখায় উদাত্ত আহ্বানে, দিকে দিকে বিচরণ করে বুদ্ধের ধর্ম প্রচার করেছিলেন। ভারতবর্ষের গন্ডি পেরিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছিল এবং ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশ ঘটেছিল। বুদ্ধ সমসাময়িক কালে বুদ্ধমূর্তি সূচনা হয়নি, এবং বুদ্ধ মূর্তির উৎপত্তি সংক্রান্ত সময় জ্ঞাপক কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ বৌদ্ধ সাহিত্যাদিতে নেই। কিন্তু পরবর্তী কালে বুদ্ধের মূর্তিগড়া বা মূর্তিপূজার শুরু প্রচলন হয়। বুদ্ধের বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত বিভিন্ন বর্ণনা আমরা সুত্তপিটকের দীঘনিকায়ের লক্ষণ সূত্রাঙ্কে এক বিবরণ মিলে। যেমন—১। সুপ্রতিষ্ঠিত পাদ, ২। লাঞ্জন পদতল, ৩। আয়ত পাশ্ব, ৪। দীর্ঘ অঙ্গুলি, ৫। কোমলমৃদু হস্তপদ, ৬। গুহ্মসন্ধি মধ্যপদ, ৭। এনীজঙ্ঘ, ৮। আজানুলম্বিত ভুজ, ৯। কোষ রক্ষিত গুহ্য ইন্দ্রিয়, ১০। সুবর্ণত্বক, ১১। সূক্ষ্ম চর্ম, ১২। প্রতি লোমকূপ, ১৩। উর্ধ্বাগ্ররোম, ১৪। দিব্য ধাতু প্রত্যক্ষ, ১৫। সপ্ত উৎসদ, ১৬। সিংহ পূর্বাদ্ধ, ১৭। উন্নত বক্ষ, ১৮। ন্যাগ্রোধ পরিমণ্ডল, ১৯। সমবেত স্কন্ধ, ২০। রসপ্রাগ্রসিদ্ধ, ২১। সিংহ হনু, ২২। চল্লিশ দণ্ড, ২৩। সমদণ্ড, ২৪। সুশুক্ল দন্ত, ২৫। অবিরল দন্ত, ২৬। প্রভূততনু জিহ্বা, ২৭। ব্রহ্মস্বর, ২৮। আর্বতকের শির কৌকড়ানো মাথার চুল, ২৯। সমললাট, ৩০। অভিনিলনেত্র পক্ষ। ৩১। উর্গাকোশ, ৩২। উষষী শীর্ষ।

এসব লক্ষণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে বুদ্ধের বিভিন্ন মুদ্রার মূর্তি যেমন— ভূমিস্পর্শ মুদ্রা, দেশনা মুদ্রা, ধ্যানমুদ্রা, বা বরদা মুদ্রা, দণ্ডায়মান মুদ্রা এবং চারিকা মুদ্রা।

পালি সাহিত্য ছাড়াও বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যেও বুদ্ধমূর্তির বা মুদ্রার বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। এবং বিভিন্ন বিভাজন পরিলক্ষিত হয়। এবং বুদ্ধ মূর্তি দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় প্রচার ও প্রসার লাভ করে দ্রুত ভাবে বুদ্ধমূর্তি তিব্বত, মধ্য এশিয়া, পূর্ব এশিয়ায় চীন, কোরিয়া, জাপান ও মঙ্গোলিয়ায় বিস্তার লাভ করে। আবরণ ও আকারের স্থানীয় ও কাল ভেদে দেখলে মূর্তির গঠন সৌষ্ঠবে মহাপুরুষ লক্ষণ আবশ্যিক। সংঘরাজ ড. সত্যপাল ভিক্ষু কর্তৃক রচিত বুদ্ধ মূর্তি : প্রসঙ্গকথা, গ্রন্থটি, আমাদের উপাসক প্রবর, সদ্ধর্মে নিবেদিত প্রাণ ক্যান্টনমেন্ট নিবাসী শ্রী বিনয় ভূষণ বড়ুয়া'র আর্থিক সহায়তা দানে গ্রন্থটি প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়ে আপামর সকলের মহান কল্যাণ সাধন করেছেন। তজন্য আমি শ্রী বিনয় ভূষণ বড়ুয়াকে আন্তরিক সাধুবাদ ও ধন্যবাদ জানাই। আশাকরি গ্রন্থটি পাঠ করে পাঠক ধর্মরস আন্বাদন করতে সমর্থ হবেন। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।

ইতি—

বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশনের পক্ষে
সুমনপাল ভিক্ষু

বুদ্ধমূর্তি : প্রসঙ্গকথা

বুদ্ধ-মূর্তি একটি যৌগিক শব্দ। বুদ্ধ ও মূর্তি এ দু'টি শব্দের যোগে এটির সৃষ্টি। ওদু'টির প্রথমটি অর্থাৎ 'বুদ্ধ' শব্দটির উৎপত্তি পালি 'বুজ্জা' এবং সংস্কৃত 'বুধ' ধাতু হতে হয়েছে। 'বুজ্জা' বা 'বুধ' ধাতুর অর্থ হলো 'বোঝা'। যিনি বোঝেন বা যার মধ্যে কিছু বোঝার বা বোঝাবার বিশেষ গুণ বিদ্যমান তিনিই 'বুদ্ধ' নামে অভিহিত হবার যোগ্য ব্যক্তি।^১

আমাদের দেহের ভেতরে বা বাহিরে দৃশ্যাদৃশ্য অনেক কিছু আছে যেগুলি আমরা বোঝার বা অন্যকে ঐ ব্যাপারে বোঝাবার চেষ্টা করি। বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়েন বা পড়ান তাঁদেরকে জ্ঞানী-বিজ্ঞানী বলা যেতে পারে। তাঁদের জ্ঞানের গভীরতা বা ব্যাপকতার পরিধিকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষক, গবেষক, আচার্য, অধ্যাপক বা উপাধ্যায় বা মহোপাধ্যায় আদি অলঙ্কারিক পদে বিভূষিত করা হয়। তবে তাঁদের কখনো 'বুদ্ধ' শব্দে বিভূষিত করা হয় না। 'বুদ্ধ' শব্দটি একটি পারিভাষিক শব্দ। মূলতঃ প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত ও পালি ভাষায় এর বহুল প্রয়োগ পাওয়া যায়। বাংলায়ও এটি তৎসব শব্দরূপেও প্রযুক্ত হয়।

সামান্যত ঐটি বিশেষ্যপদ মনে হলেও এটি একটি বিশেষণ পদ। দেশের যে কোন নাগরিক তাঁর পারিবারিক নামে পরিচিত থাকেন। কিন্তু তিনি যখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে দেশের প্রথম নাগরিক হন, তখন তিনি 'রাষ্ট্রপতি' শব্দে সম্বোধিত হন। কাজেই 'রাষ্ট্রপতি' শব্দটি নানা প্রকার যোগ্যতার সূচক। তাই বিশেষণ হওয়া সত্ত্বেও কখনও কখনও বিশেষ্য পদরূপে এর প্রয়োগ হয়।

অনুরূপভাবে শুদ্ধোধন ও মহামায়াদেবীর দেওয়া নাম ছিল 'সিদ্ধার্থ' ও 'গৌতম'। 'বুদ্ধ' তাঁদের দেওয়া নাম ছিল না। কাজেই এ শব্দটি (বুধ্ + ক্ত কর্তৃ বিণ) মূলতঃ বিশেষণ পদ। তা সত্ত্বেও এর প্রয়োগ বিশেষ্য-পদরূপে তা হলেও হয়ে থাকে। (বৌদ্ধ সাহিত্যে 'বুদ্ধ' শব্দটি একটি বিশেষ পারিভাষিক শব্দ। শুধু তা বললেই সব বলা হয় না। এটি একটি সর্বাধিক জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। এ প্রসঙ্গে এ তিনটি প্রশ্ন এসে পড়ে—(১) কে বুদ্ধ হলেন? (২) কিভাবে বুদ্ধ হলেন? আর (৩) কেন বুদ্ধ হলেন?

সংসারে ব্যক্তির মহিমাকে তিনটি দৃষ্টিতে মূল্যায়ণ করা হয়। ঐ চারটি হলো— (১) শারীরিক লক্ষণ, (২) তাঁর ভোগসম্পত্তির বিশ্লেষণ, (৩) তাঁর আচার-বিচার এবং (৪) জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পন্নতার লক্ষণ। ঐ চার দৃষ্টিতে গৌতম কেন বুদ্ধ ছিলেন তা এখানে সংক্ষেপে বর্ণিত হবে।

সদলবলে দেবদহের উদ্দেশ্যে গমনরতা মহামায়াদেবীর শারীরিক পীড়া অতিমাত্রায় বেড়ে উঠায় কপিলাবাস্তু ও দেবদহের মাঝপথে অবস্থিত লুম্বিনী বনে তিনি এক বৃক্ষের ডাল ধরে দাঁড়ান। তাঁর ঐ অবস্থাতে সৌম্য ও দিব্য দেহধারী এক বালকের জন্ম হয়। ঐ সময়ের অতীত কথায় অলৌকিকতার কাহিনী মিলে। যেমন, জন্মের পর ঐ বালক সুদৃঢ় পদক্ষেপে উত্তরাভিমুখী হয়ে সাত পা এগোন। প্রতিটি পা ফেলার সাথে সাথে মাটি হতে পর পর সাতটি পদ্মফুল ফুটে উঠে। শেষটিতে দাঁড়িয়ে ডান হাতের তর্জনী উঁচিয়ে নিম্নলিখিত গাথা উচ্চারণ করেন :

অশ্লো হমস্মি (আমি অশ্রু);

জেট্টো হমস্মি (জ্যেষ্ঠ আমি);

সেট্টো হমস্মি (শ্রেষ্ঠ আমি)

অয়স্তিমা জাতি (আমার এই অস্তিম জন্ম),

নখি'দানি পুনব্ভবো (এর পর আর জন্ম নেই)।^২

একদিনের ঐ শিশু যে নাদ (বাক্য) উচ্চারণ করেছিলেন তা তিনি মায়ের কোলে বসে অস্পষ্ট স্বরে বা কেঁদে কেঁদে করেন নি। কারোর চাপে পড়েও তা তাঁর মাধ্যমে উচ্চারিত হয় নি। তা তিনি করেছিলেন মাটিতে সদ্য ফোটা সাতটি পদ্মফুলের শেষটিতে দাঁড়িয়ে। ত্রিলোকে (কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোক) সদ্য ও শুদ্ধ মানবসন্তানরূপে অবতরিত বোধিসত্ত্বকে (ভাবীবুদ্ধ) দেব-ব্রহ্ম-মানব কূলের পক্ষে সুস্বাগতম অভিনন্দন জানাতে ঐ পদ্মফুল ফুটেছিল যেন প্রকৃতির কোলে জাত প্রকৃত প্রকৃতি-পুত্রকে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ উপহার প্রদান করা হয়েছিল।

এভাবে অভিনন্দিত হয়ে ডান হাতের তর্জনী আকাশের দিকে উঁচিয়ে এবং বাম হাতের আঙ্গুল নীচের দিকে রেখে তিনি ঐ গাথাটি উচ্চারণ করেছিলেন। ঐ অঙ্গ-ভঙ্গিমার (মুদ্রার) মাধ্যমে কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোক ত্রিলোক নিবাসী সকল প্রাণীকে লক্ষ্য করে তিনি তাঁর কথাগুলো শুনিয়েছিলেন। তাঁর অস্তিত্বে নাম (মন) ও রূপ (দেহ) নামক যে দু'টি তত্ত্ব বিদ্যমান রয়েছে ঐ দু'টির অন্তর্গত লৌকিক ও অলৌকিক সব জ্ঞান, বল, বলবাহিনীর বশতার ক্ষেত্র। উপরের কথাগুলি বিশেষ করে সৌন্দর্যের দৃষ্টিতেও তিনি সর্বাধিক চিন্তাকর্ষক ও নয়নাকর্ষক রূপের অধিকারী ছিলেন, তা যেন ফুটে ওঠে।

তাঁর ঐ ঘোষণা কোন এক সামান্য বালকের ঘোষণা ছিল না মোটেই। তা ছিল এক অসামান্য ভাব-গম্ভীর বালকরূপী বোধিসত্ত্বের ঘোষণা। বনবাসী প্রাণীসমূহের রাজাতুল্য সিংহ যেমন অপর প্রাণী-সমূহকে শুনিয়ে কালে-অকালে নাদ (গর্জন) করে তার উপস্থিতি সূচিত করায়, তেমনিভাবে মানবপুত্ররূপে জাত বোধিসত্ত্ব তাঁর

শেষবারের মতো অবতরণের কথা এ মর্ত্যলোকের (মাররাজ্যের) রাজা মার আর মারসেনাদের (তঁার অপার বলবাহিনীকে) শুনিয়ে ঐ সিংহনাদ করেছিলেন।

একথা শোনার পর কপিলাবাস্তুর শাক্যরাজ্য শুদ্ধোধন নবজাত ও তাঁর মা মহামায়াদেবীকে কপিলাবাস্তু ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। তখন মহর্ষি কালদেবল অসিত^৩ দেবগণের অস্বাভাবিক আনন্দ ও আল্লাদের কারণ জানতে পেরে নিজে বহুদূর থেকে পায়ে হেঁটে শাক্যরাজ্য শুদ্ধোধনের রাজপ্রাসাদে আসে। নবজাতককে দেখা কালে বালকের পা হঠাৎ মহর্ষি কালদেবল অসিতের কপালে লাগে। নবজাতকের শারীরিক লক্ষণগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে মহর্ষি কালদেবল অসিত একবার হাসেন আর একবার কাঁদেন। শঙ্কিত পিতা মহর্ষি কালদেবল অসিতের কাছে এভাবে হাসি-কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। উত্তরে মহর্ষি কালদেবল বলেন—“এ নবজাতক মহাপুরুষ লক্ষণসম্পন্ন। আমার জীবনে এমন মহাপুরুষকে দেখার সুযোগ পেয়েছি, তাই হাসলাম। আর আয়ু ক্ষীণ হয়ে আসায় এ মহাপুরুষের দূর্লভ বাণী শুনে নিজের জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারলাম না, তাই কাঁদলাম”।^৪ যা হোক মহর্ষি কালদেবল অসিত আশ্রমে ফিরে এসে তাঁর ভাইপো কুমার নালককে বলেন—“হে নালক, শাক্যরাজ্য শুদ্ধোধন-তনয় যদি কখনো ধর্মোপদেশ দেন তবে তাঁর অনুসরণ করবে”।^৫

এর পর রাজা কাল-ক্ষণ, তিথি-মুহূর্ত্ত বিচার করে নক্ষত্রবিদ জ্যোতিষাচার্য ও শরীরের ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকার-গঠনের মুদ্রা বা লক্ষণ অনুসারে সামুদ্রিক বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ আটজন গণক^৬ ব্রাহ্মণকে রাজপ্রাসাদে ডাকিয়ে এনে বালকের ভূত-ভবিষ্যৎ জানার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। তাঁদের সবচেয়ে কনিষ্ঠ কৌণ্ডিন্যকে বাদ দিয়ে আর শেষ সবাই হাতের দুই আঙ্গুল উঁচিয়ে ঘোষণা করেন—“এ নবজাতক সামান্য বালক নয়। এ জাতকের ভবিষ্যতে দু’টি গতির সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমটি, গৃহী-জীবনে থাকলে ইনি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন চক্রবর্তী সম্রাট হবেন। তাঁর সাম্রাজ্যে প্রজাবৃন্দ নানা প্রকারের ভৌতিক সুখে সমৃদ্ধশালী হবে”।

দ্বিতীয়টি হলো, “গৃহত্যাগ করলে তিনি অশ্রুতপূর্ব ধর্ম-প্রবর্তনের মাধ্যমে অশ্রুতপূর্ব ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করবেন। তাঁর ধর্মশাসনের প্রণালীতে কোন প্রকারের অস্ত্র বা রক্তপাত জনিত দণ্ডবিধির প্রয়োগ হবে না। কারো প্রতি অন্যায়-অবিচার হবে না। অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োগ ছাড়াই তাঁর ধর্ম-সাম্রাজ্যের বিস্তার বিশ্বময় হবে। তাঁর ধর্মশাসনের ধার্মিকেরা লৌকিক ও অলৌকিক অপার সম্পত্তির অধিকারী হবেন। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় তিনি সহায়ক হবেন। ঐ বিশ্বশান্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে”।^৭

উপরোক্ত সাতজনকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সর্বকনিষ্ঠ গণক কৌণ্ডিন্য^৮ তাঁর ডান হাতের তর্জনী উঁচিয়ে সদর্পে বলেন—“না না, তাঁর দু’টি গতি নেই। তাঁর একটিই

গতি। গৃহী হয়ে থাকার তাঁর কোন সম্ভাবনা নেই। তিনি দণ্ডাধিকারী না হয়ে ধর্মাধিকারী হবেন। তিনি এক অশ্রুতপূর্ব ধর্মের আবিষ্কারক হবেন। সেই ধর্মরাজ্যের তিনি হবে ধর্মরাজ। তাঁর সাম্রাজ্যের প্রমুখ প্রজাবৃন্দের সবাই হবেন আর্যপুরুষ। তিনি ও তাঁর আর্যপুরুষগণের প্রত্যেকে হবেন (মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা) ব্রহ্মবিহারী। তাঁদের সবার অপরিমিত প্রজ্ঞা ও পরম নৈর্বাণিক সুখের প্রভাবে এ সংসারের আনাচে-কানাচে শান্তি সুলভ হবে।”

প্রশ্ন উঠে নবজাতকের রূপকায় এমন কি দেখেছিলেন যে তাঁকে দেখামাত্রই তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—ইনি একজন অসাধারণ মহাপুরুষ। তা হলো বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ-লক্ষণে সুশোভিত তাঁর দেহ। যেমন দক্ষ বিশেষজ্ঞগণ বস্তুর লক্ষণ দেখে কোনটি কি বা তার মূল্য কতটুকু তা সুনিশ্চিতভাবে বলে দেন, ঠিক তেমনিভাবে শারীরিক লক্ষণ বিশেষজ্ঞগণও ওসব লক্ষণগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করে বালকের ভূত-ভবিষ্যৎ একেবারে নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারেন। নবজাতকের শারীরিক সকল লক্ষণ তাঁর শৈশবকালে অবিকশিত থাকলেও ওসবের সম্ভাব্য বিকশিত রূপের এক সুস্পষ্ট ধারণা সামুদ্রিক গগনবৃন্দের মানসপটে ফুটে উঠে। একজন সাধারণ মানুষের যে সব লক্ষণ থাকে তার চেয়ে অনেকগুণে উন্নত ও স্পষ্ট অনেক লক্ষণ বিদ্যমান থাকে অপর ভাগ্যবান, ভোগবান ও গুণবান মানুষের শরীরে। মানুষের মানসিক ও চারিত্রিক গুণাবলী অদৃশ্য থাকলেও ওসবের বহিঃপ্রকাশ শারীরিক লক্ষণসমূহের মাধ্যমে হয়। তাই শারীরিক লক্ষণসমূহের বিচার-বিশ্লেষণের এক বিশেষ মান্যতা সবদেশের জনমানসে রয়েছে। এসব বিদ্যা-চর্চার এক বিশেষ শাস্ত্রও রচিত হয়েছে।

এর পর আসে নবজাতকের নামকরণের পালা। কপিলাবাস্তুর রাজা শুদ্ধোদন ও রাণী মহামায়ার জীবনে সর্বাঙ্গ সুলক্ষণ সম্ভানের মা-বাবা হবার দীর্ঘকালের সাধ (অর্থ) এ বালকের জন্মের সাথে মেটে, তাই ঐ জাতকের নাম রাখা হয় (সর্বার্থসিদ্ধ) সিদ্ধার্থ।^{১৬} নবজাতকের জীবনে সব সম্ভাব্য অভিলাষ (অর্থ) অচিরে পূর্ণ (সিদ্ধ) হোক এ সদিচ্ছায়ও বালকের নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ। এ বালকের সান্নিধ্যে যারা ভবিষ্যতে আসবেন তাঁদের সবার সদ্ধাসনাও (অর্থ) সিদ্ধ হবার পথ প্রশস্ত হোক এ বাসনা অর্থেও বালকের নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ।

এভাবে কালের গতিতে ঐ বালক রাজকুমার সিদ্ধার্থ ক্রমে ক্রমে শৈশবকালে পেরিয়ে কৈশোরে পা রাখেন। জ্যোতিষ আচার্যগণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ঐ রাজকুমার শাস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, ধনুবিদ্যা আদি লৌকিক সব বিদ্যায় নিপুণতা অর্জন করেন। ষোলবছর বয়সে অপর এক অপরাধী ষোড়শী কোলিয়ধীতার সাথে তাঁর বিয়ে হয়। ঐ রাজকুমারীর নাম ছিল যশোধরা।^{১৭} যেমন তাঁর নাম, তেমন তাঁর

রূপসৌন্দর্য। ঠিক তেমনিই ছিল তাঁর চরিত্র মাধুর্য। দুইয়ে মিলে যেন একেবারে সোনায়ে সোহাগা। উভয়ের তের বছরতম শুদ্ধ বৈবাহিক জীবন আসলে তাঁদের এক পুত্র-সন্তানের প্রাপ্তি ঘটে।

এ পুত্র কিন্তু তাঁর পিতার ন্যায় জন্মক্ষণে কোন সিংহনাদ করেন নি। সামান্য সন্তানের ন্যায় অব্যক্ত কথা বা কান্নাকাটি করে এ বালক তাঁর মায়ের কোল আলো করে জন্মেছিলেন মাত্র। এ সন্তান রূপবান হলেও তাঁর পিতা সিদ্ধার্থের ন্যায় সমলক্ষণসম্পন্ন ছিলেন না। এ বালকের জন্মে মা যশোধরা, ঠাকুরদা শুদ্ধোদন, ঠাকুর মা মহাপ্রজাপতি গৌতমী, রাজ-পরিবারের আর সবাই আনন্দে-আহ্লাদে আত্মহারা হলেও তাঁর পিতা রাজকুমার সিদ্ধার্থ কিন্তু আনন্দে আত্মহারা হন নি। নগর-ভ্রমণ কালে একদিন এক বার্তা-বাহকের মুখে তাঁর এক পুত্ররত্ন প্রাপ্তির কথা জানতে পেরে সিদ্ধার্থ ভাব-গভীর মুদ্রায় হঠাৎ বলে ফেলেছিলেন “রাহুল এসেছে, বন্ধন এসেছে”।^{১১} রাজকুমারের মনের কথা বুঝতে না পেরে বার্তাবাহক মনে করে যে নবজাতকের নাম ‘রাহুল’ রাখা হলো। সাথে সাথে বার্তা-বাহক ঐ আনন্দবার্তা বয়ে নিয়ে যায় রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে। রাজপ্রাসাদে আনন্দধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে। সানন্দে ও সাড়শ্বরে নবজাতকের নাম রাখা হয় “রাহুল”। আপন ছন্দে, অপার আনন্দে রাহুল বেড়ে চলে মা যশোধরার কোলে, রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে আর অপার রাজবৈভবের মাঝে।

অন্যদিকে রাজকুমার সিদ্ধার্থ তাঁর পত্নী যশোধরা, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন, রাজা-প্রজা কারোর প্রতি কোন প্রকারের মায়ামমতা না দেখিয়ে রাহুলের জন্মের দিন (আষাঢ়ী পূর্ণিমা) রাতে সবার অগোচরে সারথী ছল্ল ও অশ্ব কঙ্ককে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তা ছিল তাঁর অর্থাৎ এক ভাবী বুদ্ধের (বোধিসত্ত্বের) মহাভিনিক্ষেপ; পরম জ্ঞান ও পরম সুখের সন্ধান। এক প্রত্যস্ত অনোমা নদীর ধারে রাজকীয় বেশভূষা সারথীর হাতে দিয়ে তিনি ছল্ল ও অশ্বসিদ্ধ কঙ্ককে বিদায় দেন।^{১২}

পীতবস্ত্রধারী হয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে মহাত্যাগীর পূর্ণ প্রতিমূর্তি তাপস সিদ্ধার্থ এগিয়ে চলেন এক অজানা অচেনা দেশের উদ্দেশ্যে। কয়েক রাজ্য পেরিয়ে শেষে পৌঁছোলেন তিনি মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী পাঁচ পাহাড়ে ঘেরা রাজগৃহে।

ক্রমান্বয়ে বেশ কয়েকদিন চির অভ্যস্ত আহার-পানীয়ের অভাবে এবং অনভ্যস্ত উচ্ছিষ্ট ও বর্জিত আহার গ্রহণের প্রভাবে তাপস সিদ্ধার্থের কাঞ্চন-বর্ণের রূপ (কায়) বিবর্ণ ও জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়ে। একদিন মগধরাজ বিন্ধিসার তাঁর রাজপ্রাসাদের উপরিতলে বসে রাজপথে চলা পথচারীদের দেখছিলেন। হঠাৎ তাঁর শ্যেনদৃষ্টি শান্তদাস্তভাবে গমনশীল এক পীতবস্ত্রধারী ভিক্ষাচারীর প্রতি পড়ে।

“ত্বমদসা বিশ্বিসারো, পাসাদস্মিং পতিট্ঠিতো।

দিস্বা লক্খণসম্পন্নং, ইমমথং অভাসি।

ইমং ভস্তুে নিসামেথ, অভিরূপো ব্রহ্মসুচি।”^{১৩}

ঐ ভিক্ষুকবেশী যতই নিজেকে নামগোত্রহীন করে রাখুক না কেন, যতই তিনি দুর্বল ও বিবর্ণ হয়ে পড়ুক না কেন, তাঁর দেহ-সৌষ্ঠবের (যষ্টি) কোথাও না কোথাও রাজবংশোদ্ভূত হবার বিশেষ লক্ষণসমূহ পার্থী রাজা বিশ্বিসারের দৃষ্টি এড়াতে পারে নি।

রাজা বিশ্বিসারের জীবনে ঘটিত আরো কিছু এমন ঘটনা ঘটেছে যা হতে স্পষ্ট সঙ্কেত পাওয়া যায় তিনি এব্যাপারে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি এক গুপ্তচরকে নির্দেশ দিলেন তাপস সিদ্ধার্থের দিনচরিত্রা সম্পর্কে বিশেষ নজর রাখার এবং গোপন খবর সংগ্রহ করার। রাজার নির্দেশে রাজদূত ঐ তাপসের অনুগমন করে ঐ পাঁচ পাহাড়ের একটিতে পৌঁছোন। ঐ পাহাড়ের নাম পাণ্ডব। এ পাহাড়েরই এক গুহায় ঐ তাপস থাকতেন। বেশ কয়েকদিন পর রাজার প্রেরিত ঐ রাজদূতের মুখে ঐ ভিক্ষুকের গোপন খবর পেয়ে রাজা তাপস সিদ্ধার্থকে ডাকিয়ে আনেন রাজপ্রাসাদে।

রাজা নিজ হাতে আসন পেতে তাঁর আদর-আপ্যায়নের এবং আহালাদি দানের ব্যবস্থা করেন। এরপর মগধরাজ তাঁর কাছে তাঁর পরিচয়, তাঁর রাজগৃহে আগমনের কারণ ও তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য জানতে পারলেন ভিক্ষাচারীবেশী এ তাপস তাঁরই বন্ধুবর শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের পুত্র। পরম জ্ঞান, পরম শান্তির খোঁজে তিনি মহাভিনিক্ষমণ করেছেন। যাত্রাপথে নানা খ্যাতনামা গুণী ও গণের আচার্যদের মত ও পথ অনুশীলন করেছেন। তখন ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী ও যতিরা নিজের নিজের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য মতে নানা গণ বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। তাঁদের মত ও পথে তাঁর অভীষ্ট পরম জ্ঞান ও পরম সুখের সন্ধান না পেয়ে তিনি এবার তৎকালীন তীর্থরাজ গয়া যাবার প্রস্তুতি নিয়েছেন।

রাজা বিশ্বিসার তাঁর বন্ধুপুত্র তাপস সিদ্ধার্থকে অর্ধেক রাজ্য দেবার আশ্বাস দেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে তাঁর সঙ্কল্পে অটুট দেখে আর বেশী সাধাসাধি করলেন না। তবে অনুরোধ করলেন অভীষ্ট পরম জ্ঞান পরম সুখ পেলে তিনি যেন অবশ্যই রাজগৃহে আসেন এবং তাঁকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দান করে কৃতার্থ করেন। তাপস সিদ্ধার্থ নীরবে সম্মতি প্রদান করলেন।^{১৪}

এরপর তাপস সিদ্ধার্থ এক অজানা আকর্ষণে গয়ার পথে এগিয়ে চলেন। কয়েকদিনের পদযাত্রার পর তীর্থরাজরূপে অতিখ্যাত গয়ায় এসে পৌঁছোন। সেখানে দূর দূর জনপদ হতে আগত তীর্থযাত্রী, পুণ্যার্থী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম্যাচার্যগণকে নিজ নিজ শিষ্য-সমূহের সাথে নানা আকারের নানা প্রকারের তপশ্চর্যা করতে দেখেন।

কাউকে দেব-দেবী বা তথাকথিত ঈশ্বর বা ব্রহ্মার নামে জটাবঙ্কলধারী হতে দেখেন, কাউকে অগ্নিহোত্রী হতে দেখেন। কাউকে শ্মশানবাসী হতে দেখেন। কাউকে নীলাম্বরী হতে দেখেন। কাউকে আবার মাসে একবার কুশাগ্রে রাখা সামান্য অন্ন খেয়েও তপশ্চর্যা করতে দেখেন।^{১৫} কাউকে বহু বিত্ত ব্যয় করে যত্নাতি করতে দেখেন। কাউকে পঞ্চাগ্নি তপ করতে দেখেন। আবার অনেককে নানা প্রকারের কৃচ্ছ্রসাধন করতেও দেখেন। যাগযজ্ঞে অত্যাবশ্যক ঘৃতের অনাবশ্যক পরিমাণে প্রযুক্ত হওয়ায়, বলি দেবার উদ্দেশ্যে আনীত যূপকাণ্ডে বাঁধা যজ্ঞপশুর উপর ধর্মাচরণের নামে পাশবিকভাষাপূর্ণ নির্মম অচ্যাচার হওয়ায়,^{১৬} তাদের আর্তনাদে, তাদের রক্ত-রঞ্জিত মাটিতে নৈরঞ্জনা (ফল্লু) নদী^{১৭} ও গয়ার আকাশ-বাতাস পরিবেশ প্রদূষিত হয়ে পড়েছিল।

এসব দেখে তাঁর হৃদয় মহাকরুণায় দ্রবিত হয়। যজ্ঞাগ্নিতে পরিবেশ প্রদূষণের কারণে তিনি বোধ হয় তথাকথিত তীর্থরাজ গয়া ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জীব ও জগতের তথাকথিত স্রষ্টার আবাসভূমি সত্ত্বার বাইরে কোথাও না পেয়ে এবার তিনি নিজের ভেতরে তাকে খোঁজার সঙ্কল্প নেন। ঢেকিতে ধান কুটলে বা যন্ত্রে সম্ভ্রমিত করলে ধান যেমন চ্যাপ্টে হয়ে ক্ষীণ হয় আর তার ভেতরের রস (নির্যাস) বাইরে বেরিয়ে আসে, ঠিক তেমন বোধিসত্ত্ব তাপস সিদ্ধার্থও কৃচ্ছ্রসাধন বা আত্ম-নিপীড়নের মাধ্যমে শরীরকে চিড়ে-চ্যাপ্টের ন্যায় করার সিদ্ধান্ত নেন যাতে জীবন ও জগতের তথাকথিত ব্রহ্মকা বা ঈশ্বর যদি ভেতরে কোথাও থেকে থাকে তাহলে ত্রাহি ত্রাহি করে বেরিয়ে এসে যেন নিজের স্বরূপ প্রদর্শন করেন। তাই একাজে আত্ম-নিপীড়নকে অন্য মার্গ অপেক্ষা অধিক সহায়ক মনে করে তিনি যার-পরনাই আত্ম-নিপীড়নের অশ্রুতপূর্ব দুষ্কর তপশ্চর্যা করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।^{১৮}

গয়া ছেড়ে নৈরঞ্জনা (নিরঞ্জনা বা নীলাঞ্জনা) নদীর ধার ধরে জলশ্রোতের বিপরীত দিকে এগিয়ে চলে। সেনানি-গ্রামের কাছে অপেক্ষাকৃত এক নির্জন এলাকায় পর্বতগুহায় তিনি তাঁর তপস্যায় রত হন। প্রথম পর্বে স্থূল-আহারের পরিমাণ ক্রমশ তিনি কমাতে থাকেন। এর পরবর্তী পদক্ষেপে ফল-বীজের দানা খেয়েও তিনি তপশ্চর্যায় লীন হতে থাকেন।^{১৯} ঐ সময় কপিলাবস্ত্রবাসী গণক ব্রাহ্মণ কৌণ্ডিন্য সহ আর চারজন (বল্ল, ভদ্রীয়, অশ্বজিৎ ও মহানাম) ব্রাহ্মণ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে সংযোগ-বশতঃ গয়ার আশে-পাশে কৃচ্ছ্র-সাধনের তপশ্চর্যায় ব্রতী হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তাপস সিদ্ধার্থের দুষ্কর কৃচ্ছ্রসাধনার উৎকর্ষতা চরম পর্যায়ে।

গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় থাকায় মাঝে-মধ্যে গ্রামবাসীরা বিশেষতঃ রাখাল বালকেরা সিদ্ধার্থের তপ্তপাভূমির পাশ দিয়ে যেতো। তাঁদের চোখে এধরণের কৃচ্ছ্রসাধন এক অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা। গ্রামের পশুচারকরা এমন তপশ্চর্যার কথা গ্রামবাসীদের কাছে

উৎসাহের সাথে শোনায। গ্রামবাসীদের মুখে মুখে তাপস সিদ্ধার্থের তপশ্চর্য্যার কথা সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। কপিলাবস্তু হতে আগত ঐ পাঁচজন তাপসের কানেও একথা যায়।

এদিকে ঐ পঞ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ তপস্বী দীর্ঘদিন যাবৎ তপশ্চর্য্যা করলেও এতদিন কাউকে তাঁরা গুরুরূপে মেনে নেন নি। তাই তাঁরা লোকমুখে শোনা ঐ ধরনের কঠোর তপশ্চর্য্যাকারীর খোঁজে বেড়িয়ে পড়েন। শেষে তাপস সিদ্ধার্থের তপোভূমিতে এসে পৌঁছোন। যা দেখলেন তা তাঁদের কাছে সত্যই অদৃষ্টপূর্ব। এমন কি অশ্রুতপূর্ব হওয়ায় তাঁরা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। মনে মনে তাঁরা তাঁকে তাঁদের গুরুরূপে মেনে নেন। আর তপশ্চর্য্যার সাথে তাঁর সেবা-শুশ্রূষায় মনোযোগ দিলেন। তাঁদের সেবা-সংকার পাওয়া সত্ত্বেও তাপস সিদ্ধার্থ তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনের চরম পর্য্যায় নিরাহার ও নির্জলা-উপবাস। ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন নিরাহারে নির্জলা-উপবাসে থাকায় তা তাঁর কাছে একেবারে প্রাণান্তকর হয়ে উঠেছিল। সংজ্ঞাহীন হয়ে তিনি কয়েকবার মূর্ছা যান।

এভাবে মহাভিনিক্ষমণের পর তাঁর প্রায় ছ'বছর কাটতে চলছিলো। তাঁর হস্ট-পুষ্ট কাঞ্চনবর্ণ দেহ-কাঠামো একেবারে অস্থি-কঙ্কাল-সার ও বিবর্ণ হয়ে পড়ে। চোখের মণি দু'টো এমনভাবে কোটরগত হয়ে পড়ে যেন ওগুলো গ্রীষ্মকালের এক গভীর কুয়ের মাটিছোঁয়া জলে দৃশ্যমান দু'টো উজ্জ্বল মণি।^{১০} তাঁর দেহযষ্টি ক্ষীণ হতে এতই ক্ষীণতর হয়ে পড়েছিলো যে দেখামাত্রই মনে হতো তাঁর দেহে যেন রক্ত-মাংস বলতে কিছুই নেই। শিরা-উপশিরায় আবৃত তাঁর হাঁড়-পাঁজরগুলো যেন স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। উদরের পাকস্থলী যেন শুকিয়ে একেবারে মেরুদণ্ডকে ছুঁয়েছে। সব মিলে দেখে মনে হতো তিনি যেন নিষ্প্রাণ কন্টকাকীর্ণ শুকনো এক ছোট আকারের বৃক্ষ। তা যেন পদ্মাসন-আকারের মূলাধারে দাঁড়িয়ে আছে। মার এসে বারে বারে নানাভাবে ভয় দেখিয়ে বলতে থাকেন—“হে তাপস, তোমার নিরানন্দই শতাংশ জীবন মৃত্যুর সন্নিগটে, কেবল একাংশই বাঁচার সম্ভাবনা রয়েছে।”

“কিসো ত্বমসি, দুঃখেন্নেস, সন্তিকে মরণং

সহস্‌সভাগো মরণস্‌স, একংসো তব জীবিতং”^{১১}

এরপর পঁয়ত্রিশ বছর আয়ুষ্কাল পূর্তির বৈশাখী পূর্ণিমার প্রাক্কালে হঠাৎ তাঁর একবার আবার জ্ঞান ফিরে আসে। তিনি বুঝতে পারেন তাঁর এ প্রাণান্তকর কৃচ্ছ্রসাধনের কোন সপরিণাম নেই। পরম জ্ঞান ও পরম সুখ প্রাপ্তির জন্যে প্রয়োজন পরমতা-প্রাপ্ত সুস্থ মনের। আর সুস্থ মনের জন্যে প্রয়োজন সুস্থ দেহের। সুস্থ দেহধারী হতে হলে প্রয়োজন হয় পরিমিত সুস্থ (পৌষ্টিক) আহার। তাই তিনি সুখ প্রাপ্তির পরম্পরাগত দুই অভিমাগ ত্যাগ করে মধ্যম-মার্গ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নেন।^{১২} ঐ পঞ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ তাপসদের

সেবা-শুশ্রূষায় তিনি কোনক্রমে ভিক্ষান্ন সংগ্রহার্থে গ্রামে বিচরণ করার মনোবল যোগান।

আর একাই তিনি বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তাঁদের অগোচরে পাশের একগ্রামে স্থিত প্রাচীন বৃক্ষ-দেবতা-রূপে মান্যতা প্রাপ্ত এক অশ্বথ-বৃক্ষের ছায়াতলে যান খানিকক্ষণ বিশ্রামের জন্যে আর সেখানে বসেন।

ঐ গ্রামেরই এক গ্রামনী উন্নত-গৃহপৈতির এক কন্যা ছিল। নাম তাঁর সুজাতা।^{২০} বিয়ের পূর্বে পূর্বোক্ত বৃক্ষ-দেবতার পূজো দিয়ে মানত করেছিলেন ভাল পরিবারে বিয়ে হলে আর তাঁর গর্ভে পুত্র-সন্তান জন্ম নিলে তিনি বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি ক্ষীরান্ন দিয়ে পূজো দেবেন। ঐ দুই ইচ্ছারই পূর্তি হওয়ায় বেশ কয়েকদিন পূর্ব হতেই এ বৈশাখী পূর্ণিমায় পূজো দেবার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তিনি।

পূর্ব পরিকল্পনা মতে তিনি সখীদের পাঠান বৃক্ষদেবতার গোড়া আর আশপাশ পরিষ্কার করার আর তা পূজোর যোগ্য করার নির্দেশ দিয়ে। সখীরাও আর কালবিলম্ব না করে ঐ বৃক্ষ-দেবতার কাছে যায়। ঐ বৃক্ষ-দেবতার ছায়াতলে এক ক্ষীণকায় সন্ন্যাসী তাপসকে বসে থাকতে দেখে তো তাদের আহ্বাদের আর ঠিকানা ছিলো না। তাদের ধারণা হয়েছিলো সুজাতার ক্ষীরান্ন-নৈবেদ্য গ্রহণ করতে বৃক্ষ দেবতা নিজে এ সন্ন্যাসী তাপসের বেশে এখানে বসেছেন।

তারা সবাই হস্ত-দস্ত হয়ে ছুটে গিয়ে সুজাতাকে এ খবর দেয়। সুজাতাও তাঁর বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি ক্ষীরান্ন সোনার পাত্রে ভরে অতি শ্রদ্ধায় ঐ বৃক্ষ-দেবতার কাছে যান। সংক্ষিপ্ত বার্তালাপের পর সুজাতা তাঁর ক্ষীরান্নভরা সোনার পাত্রটি তাপস সিদ্ধার্থের হাতে তুলে দেন।

শেষে বলেন “আমার যেমন মানস-পূর্তি হয়েছে, তেমন আপনারও হোক”।

ঠিক ঐ সময় ঐ পাঁচজন ব্রাহ্মণও তাঁদের গুরু তাপস সিদ্ধার্থকে স্বস্থানে দেখতে না পেয়ে খোঁজ করতে করতে ঐ বৃক্ষ-দেবতার কাছে এসে পৌঁছেন। সুজাতার হাত হতে ক্ষীরান্নে ভরা সোনার পাত্র নিতে দেখেন। তা দেখেই তাঁদের মনে সন্দেহ উৎপন্ন হয় যে “বোধ হয় তাঁদের গুরু (তাপস সিদ্ধার্থ) পথভ্রষ্ট হয়েছে”।^{২৪}

তাঁরা তৎক্ষণাৎ গুরুকে ত্যাগ করেন। তাঁরা উরুবেলা গ্রাম এবং এমন কি মগধরাজ্যও ত্যাগ করেন।

অন্যদিকে বৃক্ষ-দেবতা এর পর নৈরঞ্জনা (নির্মল) নদীর প্রাণজুড়ানো নির্মল ও শীতল জলে স্নান করেন আর অপর পারে গিয়ে ‘সুপ্রতিষ্ঠিত তীর্থে’ বসে ক্ষীরান্ন গ্রহণ করেন। আর সোনার পাত্র নদীর জলে ভাসিয়ে দেন। বিশেষ দিব্য ওজঃশক্তিতে পরিপূর্ণ ক্ষীরান্ন খাওয়ায় তখন তাপস সিদ্ধার্থের দেহ-শক্তি ফিরে আসে। তা হতে

লুপ্তপ্রায় বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণসমূহ ঐ দিন সন্ধ্যায় ক্রমে ক্রমে পুনরায় আপনরূপে প্রতিভাত হয়।

এরপর সেদিন বিকালে উরুবেলার নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অবস্থিত পঁয়ত্রিশ বছর পুরানো অশ্বখ-বৃক্ষতলে পদ্মাসনে বসে ‘এ চর্ম-অস্থি-মাংসাদি সব শুকিয়ে যাক না কেন অতীষ্ট লক্ষ্য প্রাপ্ত না হওয়াকাল অবধি আমি এ আসন ত্যাগ করবো না।’^{২৫} এমন এক বজ্রকঠিণ সঙ্কল্প তাপস সিদ্ধার্থ গ্রহণ করেন। তাই তাঁর ঐ আসনের নাম হয়েছে বজ্রাসন।

সেদিন রাতে মার-বিজয়ের সাথে তাঁর চিরবাক্তিত পরম জ্ঞান (সম্বোধি) ও পরম সুখের (নির্বাণ) প্রাপ্তি ঘটে। তৎক্ষণাৎ তাঁর মনোজগত সম্বোধি আলোতে উদ্ভাসিত হয়েছিল। তাঁর অন্তর্জগতের সব ক্রেশের (অঞ্জন) আবরণ ধুয়ে মুছে যেন একেবারে নিরঞ্জন হয়ে গেলো। আর সব রহস্যের সমাধান হয়েছিল। সমস্ত প্রকারের ভয়-বন্ধন, অনিশ্চয়তা, দাহ-পরিদাহ, অনুতাপ-পশ্চাত্তাপ, জ্বালা-যন্ত্রার অন্ত ঘটেছিল। বর্তমান জীবনে এ প্রথম দুঃখ-মুক্ত হয়ে অতুলনীয় বিমুক্তি রসে তিনি অভিষিক্ত হন।^{২৬}

যেসব গুণে মণ্ডিত হয়ে তিনি বুদ্ধ হয়েছিলেন ওসবের সংখ্যা অনেক হলেও সংক্ষেপে তা নিম্নলিখিত নয়টি :

ইতিপি সো ভগবা অরহং, সম্মাসম্বুদ্ধো, বিজ্জাচরণসম্পন্নো, সুগতো, লোকবিদু, অনুত্তরো পুরিসদম্ম সারথী, সথা দেবমনুস্সানং, বুদ্ধো ভগবাতি।^{২৭}

যার মধ্যে এ নয়টি গুণ বিদ্যমান তিনিই বুদ্ধ নামে সম্বোধিত হবার যোগ্যতা ধারণ করেন। দেব-ব্রহ্ম-অপায় কূলে উৎপন্ন কোন প্রাণী বুদ্ধ হতে পারেন না। কাম-ভব, রূপ-ভব ও অরূপ-ভব যুক্ত এ ত্রিভবের কেবল মনুষ্যালোকে উৎপন্ন মানুষরূপী বোধিসত্ত্বই বুদ্ধ হতে পারেন। তাঁর পূর্ব অনন্ত জন্মের পারমী পূর্তির পুণ্যপ্রভাবে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ।

কে বুদ্ধ হলেন?

উপরোক্ত বিবরণ হতে স্পষ্ট হয় যে শুদ্ধোদন ও মহামায়াদেবীর পুত্র সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে মনে হলেও বস্তুত বুদ্ধত্বের কিছুই তিনি (গৌতম বা সিদ্ধার্থ) মাতাপিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পান নি। দীপঙ্কর বুদ্ধের পাদমূলে শুয়ে সুমেধ পণ্ডিত পামে এক সত্ত্ব (সং + ত্ব) বোধিসত্ত্বরূপে বুদ্ধ হবার (বোধি প্রাপ্তির) যে বজ্রকঠিণ সঙ্কল্প নিয়েছিলেন (ঐ উত্তরাধিকার সূত্রে) তারই পরিপূর্ণতা বা প্রস্ফুটন বুদ্ধ-রূপে হয়েছে মাত্র। বস্তুত এক বোধিসত্ত্বই নিজ প্রয়াসে স্বয়ম্ভু সম্যক্ সম্বুদ্ধ হয়েছেন।

কিভাবে বুদ্ধ হলেন?

অনন্ত জন্মের নিরবচ্ছিন্ন পারমিতা (বিশুদ্ধিতা) পূর্তির অনন্ত পুণ্যপ্রভাবে কোন এক বোধিসত্ত্ব তাঁর শেষ জন্মে নিজের নির্মল জ্ঞানে মনের মলিনতা অর্থাৎ মারকে মর্দন করে আর্যসত্যকে পরিপূর্ণ আকারে জেনে সম্যক্ সম্বুদ্ধ হন।

কেন বুদ্ধ হলেন?

সমস্যাগ্রস্থ প্রাণীকে ন্যায়-নীতি-সত্যের পথ দেখিয়ে সমস্যামুক্ত করানো এবং মুক্তিকামী সকলকে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা হতে চিরতরে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে তিনি মহাকরুণাবশতঃ বুদ্ধ হন।

পঁয়তাল্লিশ বছরের বুদ্ধচর্য্যা পালন করার পর তিনি (বুদ্ধ) আশি বছর বয়সে কুশীনারার যমক-শালরাজ-বৃক্ষ-মূলে সিংহশয্যায়া শায়িত হয়ে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। এক বৈশাখী (বুদ্ধ) পূর্ণিমা তিথিতে এক সত্ত্বের জন্ম, জন্মের পঁয়ত্রিশ বছর পর আবার ঐ একই তিথিতে তাঁর সম্বোধি প্রাপ্তি এবং এর পঁয়তাল্লিশ বছর পর আবার ঐ একই তিথিতে তাঁর পরিনির্বাণ ঘটে। বুদ্ধ প্রদীপের আলো নিভে গিয়েছিল চিরতরে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে তখন তিনি সিংহশয়ন। এমন নির্ভীক ও প্রশান্ত মুদ্রায় পরিপূর্ণ আয়ুতে ঐ স্বাভাবিক ঘটনা বুদ্ধ ব্যতীত আর আমার পূর্নজন্ম হবে না' বলে যে সিংহনাদ করেছিলেন, ঐ কথার সত্যতা তিনি তাঁর সিংহশয্যায়া শায়িত হয়ে পরিনির্বাণ তা সিদ্ধ করেন। তাই তাঁর এমন অতুলনীয় ঘটনা মহাপরিনির্বাণ রূপে আখ্যায়িত করা হয়।

সম্বোধি-প্রাপ্তির পর তাঁর মনোজগত বিমুক্তিরসের অপরিমিত ও অতুলনীয় আনন্দে অভিসিঞ্চিত হওয়ায় তাঁর দেহে বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ-লক্ষণের সাথে আশি প্রকারের অনুব্যঞ্জনও পরিপূর্ণাকারে পরিলক্ষিত হয়।^{২৮} ঐ সব দৈহিকগুণে গুণমণ্ডিত হয়ে তাঁর দেহ দিব্য আভা-মণ্ডিত হয়েছিল। স্বভাবতই গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্ন আকাশে বিচরণশীল দেদীপ্যমান সূর্যকে দেখা যেমন সামান্য মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি তাঁর অসাধারণ দিব্য আভা মণ্ডিত দেহবর্ণও সামান্য মানুষের পক্ষে অসহনীয় হয়ে পড়ে। বুদ্ধ যখন তাঁর ঋদ্ধিশক্তির (প্রতিহার্য) প্রভাবে পূর্ণ আভায় মণ্ডিত থাকেন তখন সূর্যের চমকও জোনাকি পোকার চমকতুল্য ক্ষীণ হয়ে পড়ে (তিসহসিস্ মহাসহসিস্ লোকধাতুয়া আলোকফরণসমখো মহাব্রহ্মা পি সুরিয়ুগ্গমনে খজ্জপনকো বিয় অহোসি)। একে তো বুদ্ধোৎপত্তি বড়ই দুর্লভ ব্যাপার।^{২৯} তদুপরি সম্যক্ সম্বুদ্ধগণ সব সময় তাঁর দুর্লভ দিব্য আভায় শোভায়মান থাকেন না। সীমিত কয়েকটি বিশেষ অবসরে তিনি পূর্ণ দিব্য আভায় মণ্ডিত থাকেন।^{৩০} তাই সবার সৌভাগ্যও হয় না তাঁর প্রত্যক্ষদর্শী হবার। অধিকাংশ সময় তিনি তাঁর স্বাভাবিক সৌন্দর্যে শোভায়মান থাকেন। এ সৌন্দর্যের বর্ণনা পালি সাহিত্যের নানা প্রসঙ্গে শারদীয় পূর্ণিমা রাতের মেঘমুক্ত নীল

আকাশে নিজ কক্ষপথে বিরচণশীল দিব্য আভায় শোভায়মান নক্ষত্ররাজ বিমল চন্দ্রের সাথে তুলনা করা হয়।^{৩১}

এ প্রসঙ্গে শ্রাবস্তীর মিগারমাতা বিশাখার তৈরি পূর্বরামে ভগবান বুদ্ধের অবস্থানকালের একটি ঘটনা উল্লেখনীয়। ঘটনাটি এক আশ্বিনী পূর্ণিমা তিথির। প্রতিদিনকার মতোই ঐ বিহারেও অপরাহ্নকালীন ধর্মসভা চলছিলো। তারা নক্ষত্রমণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত নক্ষত্ররাজ বিমল চন্দ্রের ন্যায় অনুত্তর ভিক্ষু-সঙ্ঘে পরিবেষ্টিত ধর্মরাজ বুদ্ধ ঐ সভায় ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন। ঐ সভাটি আর সব ধর্মসভার মতো হলেও ঐটির গুরুত্ব ছিলো কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। কারণ কোশলরাজ প্রসেনজিত তাঁর রাজকীয় চক্রমকে মহার্ঘ্যক আভূষণে সুসজ্জিত হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন সেখানে। ঐ সভার আর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিলো কালুদায়ির উপস্থিতি। তিনি সভার একান্তে ধ্যানস্থ ছিলেন। তিনি ঐ সভাতে সদ্য অরহত্বফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর ঐ তপস্যার তেজে তিনিও আভ্যমণ্ডিত হয়ে বসেছিলেন। একে তো ধর্মসভার আলোচ্য বিষয় ছিলো অতি রোচক। তদুপরি এর পরিবেশও ছিলো ততোধিক। তাই বেলা কখন গড়িয়ে ফুরিয়ে গিয়েছিলো তার প্রতি কারোর দৃষ্টি ছিলো না।

নিত্যসেবক ভদন্ত আনন্দ ভগবান বুদ্ধের পাশে বসে থাকলেও হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি সভাগারের বাইরের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শারদীয় নীল আকাশের পশ্চিমে অস্তাচলে ডুবন্ত সিঁদুরে লালবর্ণের পূর্ণ গোলাকার দিবাকরের মনোমোহক দিব্য আলোকচ্ছটা, পূর্ব আকাশের উদ্দীয়মান নক্ষত্ররাজ বিমল পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ আভ্যমণ্ডল আর ঐ আভায় স্নাত শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছিল।

এতে আনন্দ বড়ই আশ্চর্য হয়ে পড়েছিলেন। আলোকরাজ সূর্য, নক্ষত্ররাজ চন্দ্র, ধর্মরাজ বুদ্ধ, কোশলরাজ প্রসেনজিত এবং সদ্য অরহত্বফল প্রাপ্ত যোগীরাজ কালুদায়ির তপস্যার তেজে ঐ সভাগার ও প্রাকৃতিক পরিবেশ আলোয় আলোময় হয়ে পড়েছিলো। আনন্দ যেন সেখানে বসে এক নৈসর্গিক সুখ, শান্তি ও সৌন্দর্য রস সেবনে মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ আনন্দ বুদ্ধের দিকে তাকিয়ে বড়ই প্রীতি-প্রফুল্লিত মনে বলেন—“ভগবান, চন্দ্র-সূর্যের আলোকে পুরো সংসার আলোকিত হলেও তাদের একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ, সূর্য কেবল দিনে আর চন্দ্র কেবল রাতে চম্কায়ে। ধ্যানীরা কেবল ধ্যানে থাকাকালে চম্কায়ে। আর ক্ষত্রিয় রাজা চম্কায়ে যখন তিনি রক্ষাকবচে ও রাজকীয় বেশভূষায় সুসজ্জিত থাকেন। কিন্তু সম্যক্ সম্বুদ্ধ তাঁর সহজ সুলভ দিব্য আভাতে রাত-দিন উভয়কালেই জ্যোতির্ময় থাকেন।

দিবা তপসি আদিচো, রত্তিং আভাতি চন্দিমা,

সন্নদ্ধো খত্তিয়ো তপতি, ঝাযী তপসি ব্রাহ্মণো,

অথ সৰ্ব্বমহোরত্তিং, বুদ্ধো তপতি তেজসা।^{৩২}

ধর্মপদ-২৬/৫।

নয়নাভিরাম পূর্ণচন্দ্রের দর্শনে যেমন দর্শনার্থীর মন ও প্রাণ জুড়ায় তেমনি সম্যক্
 ১। পুষ্পের দিব্যদেহ দর্শনেও দর্শনার্থী মাত্রেরই দেহ ও মন উভয়ই তৎক্ষণাৎ জুড়ায়।
 ২। প্রসন্নগণের মনে প্রসন্নতার উভয় হয়। প্রসন্নগণের মন পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রসন্ন
 ৩। ১০ দর্শনার্থীর দৃষ্টি বুদ্ধগণের গুণের প্রতি প্রথমে আকৃষ্ট না হয়ে তাঁদের রূপের
 ৪। ১০ প্রথমে আকৃষ্ট হয়।

ভারতীয় দর্শন সাহিত্যের মূলকথাটি হলো “সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্”। এর অর্থ
 ১। গোপ-যা সত্য তা শিব (‘স লোকে ভজতে সিবং’) অর্থাৎ শান্তি^{১৪} আর যা শান্তি
 ২। তা হলো চিরসুন্দর। যে সত্য সর্বকালীন, সর্বজনীন ও সর্বদেশিক তা পরমসত্য।
 ৩। পরমসত্য হতে যে সুখ-শান্তির প্রাপ্তি ঘটে তা অচল মহাশান্তির^{১৫} সূচক। যার আকার
 ৪। আছে তা সাকার আর যা কার্যকারণে পরিবর্তনশীল তা সংস্কৃত। সেগুলি কখনো পরম
 ৫। ১। পরমার্থসত্য হতে পারে না। পরমসত্য নির্বাণ সব সময়ই নিরাকার ও অসংস্কৃত।
 ৬। যে শান্তি কখনো কোন কারণে বিঘ্নিত হয় না এবং যার অধিকারী কখনো কারোর
 ৭। ক্ষতি করে না, তাই হলো পরম সুন্দরের পরিভাষা। সামান্যত সুন্দর বলতে নয়নাকর্ষক
 ৮। ১। গোলাপ ফুল সুন্দর, তবে প্রকৃতিজাত হওয়ায় তা সংস্কৃত, তাই তার
 ৯। বিকৃত হয়। কোন কিছু বিকৃত হলেই তা আর পূর্ববৎ সুন্দর থাকে না। অনুরূপভাবে
 ১০। কোন মূর্তি যতই সুন্দর হোক না কেন তা মানুষ দ্বারাই নির্মিত। অর্থাৎ তা সংস্কৃতধর্মে
 ১১। নির্মিত। কাজেই এক নিশ্চিত সময়ের পরে তাতে বিকৃতি এসে যায়। তার-সৌন্দর্য
 ১২। পূর্বের ন্যায় থাকে না। তার সৌন্দর্যে রঙ্গে-রূপে বা শিল্পে কোন প্রকার খুঁত দেখা
 ১৩। গেলেই তা আর দর্শককে পূর্বের ন্যায় নয়নসুখ প্রদান করে না। কাজেই বুদ্ধমূর্তি
 ১৪। যে দেশের আর যে শিল্পীর সৃষ্টি হোক না কেন, তার পার্থিব সৌন্দর্যটুকুতেই সীমিত
 ১৫। না থেকে দর্শককে তার মাধ্যমে তাঁর চরিত্রগুণ (শীল), তিনি যে ন্যায়-নীতির আচরণ
 ১৬। করে সমাজকে বিকাশোন্মুখ করেছেন, সমাজকে কোন প্রকারের ভেদাভেদ নির্বিশেষে
 ১৭। সবার শান্তির নীড় করে তুলেছেন, সবাইকে লৌকিক সুখের সাথে অলৌকিক সুখেরও
 ১৮। অধিকারী করার পথ প্রশস্ত করেছেন, মঙ্গলসূত্রে বর্ণিত পূর্ণ মঙ্গলময় ঐ পরম সুন্দর
 ১৯। অবস্থার কথা স্মরণ করা উচিত। “সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্” বাক্যে উক্ত “সুন্দর” শব্দের
 ২০। মাধ্যমে কোন লৌকিক বা আপাত সুন্দর সূচিত হয় না। এ সুন্দরের মাধ্যমে যে সৌন্দর্য
 ২১। সূচিত হয়, তার কোন কালে কোন প্রকারের হানি হয় না। তা থাকে চির সুন্দর।

যে সত্য, শান্তি ও সুন্দরের খোঁজে বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ তাঁর পূর্ব অসংখ্য জন্ম ধরে
 ১। অবিচ্ছেদ্যভাবে দশ পারমিতা, দশ উপপারমিতা ও দশ পরমার্থপারমিতা অনুশীলন
 ২। করে আসছিলেন তা তিনি তাঁর সংসার-ভ্রমণের শেষপাদে এসে মগধরাজ্যের নৈরঞ্জনা
 ৩। নদীর তীরবর্তী উরুবেলা গ্রামে (বর্তমান বুদ্ধগয়া) স্থিত বোধিবৃক্ষতলে সহস্র বাহুসম্পন্ন
 ৪। মার ও তাঁর অগণিত বলবাহিনীকে পরাভূত করে করায়ত্ত্ব করেছিলেন।^{১৬} তাঁর

আবিষ্কৃত ও প্রবর্তিত সত্যে চিরাচরিত “ব্রহ্মম্ সত্যম্”—এর কোন গুরুত্ব না দিয়ে যে চার আর্য়সত্যকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা এরূপ-দুঃখ আর্য়সত্য, দুঃখ-সমুদয় আর্য়সত্য, দুঃখ-নিরোধ আর্য়সত্য ও দুঃখ-নিরোধগামিনী আর্য়সত্য।^{৭৭} এ আর্য়সত্য, সর্বজনীন, সর্বদেশিক ও সর্বকালীন। মহামানব বুদ্ধের আর্য়সত্যই হলো পরম আর্য়সত্য। যিনি এ পরমার্থ সত্যের যত নিকটে পৌঁছোবেন তিনি তত বেশি শিবত্বের (শান্তি/নির্বাণের) অধিকারী হবেন। বুদ্ধ প্রবর্তিত পরম শান্তি (নির্বাণ) প্রাপ্তির আটটি চরম রয়েছে। যেমন—(১) সোতাপত্তি-মার্গ,^{৭৮} (২) সঙ্কদাগামী-মার্গ,^{৭৯} (৩) অনাগামী-মার্গ,^{৮০} (৪) অরহত্ত্ব মার্গ,^{৮১} (৫) স্রোতাপত্তি-ফল, (৬) সঙ্কদাগামী-ফল, (৭) অনাগামী-ফল এবং (৮) অরহত্ত্ব-ফল।^{৮২} এসবের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম শ্রেণীর আর্য়পুরুষ যে মাত্রার সুখ পান তা শাস্তা সুগত বুদ্ধ একবার শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডকে তাঁর ‘কাল’ নামক পুত্রের স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্তির সুখ বর্ণনা দানে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নোক্ত গাথার মাধ্যমে বলেছিলেন—

“পথব্য একরঞ্জন, সঙ্গস্ গমনেন বা,

সবলোকাধিপচেন, সোতাপত্তিফলং বরং।”

ধর্মপদ ১৩/১২

কামভব, রূপভব ও অরূপভব এই ত্রিভবে একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে রাজত্ব করেন, এমন রাজার অপার সুখ বা স্বর্গগমনের অপার সুখের চেয়েও অনেক বেশী সুখের অধিকারী হন একজন স্রোতাপত্তি মার্গলাভী ও ফললাভী আর্য়পুরুষগণের প্রাপ্ত সুখের মাত্রা আরো কত না অধিক হবে, তা গভীরভাবে ভাববার বিষয়। তথাগত বুদ্ধও একজন অরহত ছিলেন। অন্য অরহতগণের ন্যায় তিনিও ছিলেন একজন বুদ্ধ। তবে ওসব বুদ্ধ হতে তিনি ছিলেন একেবারে ভিন্ন। তিনি ছিলেন সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের অধিকারী সর্বজ্ঞ-বুদ্ধ, সম্যক্-সম্বুদ্ধ এবং স্বয়ম্ভু-বুদ্ধ। তাঁর অধিগত বিমুক্তি সুখের মাত্রা ছিলেন অতুলনীয় ও অবর্ণনীয়। সে সুখের প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে তিনি যে পরম সুন্দরের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েছিলেন এবং বুদ্ধগয়ায় মার-বিজয়ের পর চতুর্থ সপ্তাহ যাপনকালে তার মাধ্যমে তিনি নিজে যেভাবে ইন্দ্রধনুশী রঙ্গে দিব্য আভামণ্ডিত হয়ে সুন্দর হয়েছিলেন,^{৮৩} এর বর্ণনা অপর সম্যক্ সম্বুদ্ধ ব্যতীত অন্য কেহ করতে পারে না। কারণ, তা অন্য আর্য়পুরুষদের অগোচরীভূত বিষয়।

সূক্ষ্ম হাতুড়ি ও ছেনির আঘাতে এবং নিপুণ শিল্পীর কমণীয় হাতের পরশে তৈরি সুন্দরের যে সূক্ষ্মতম নিদর্শনকে দেখে সৌন্দর্য-প্রেমীরা হতবাক হয়ে পড়েন, ঐ দক্ষতা দিয়ে কিন্তু তথাগত বুদ্ধের অনুভূত সুন্দরকে আঁকা বা রূপায়িত করা যায় না। তথাগত বুদ্ধ যে সুন্দরের দ্রষ্টা ও ব্যাখ্যাত ছিলেন তার রূপায়ণ কেবল পারমিতা অনুশীলনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। শুদ্ধোদন-তনয় সিদ্ধার্থ যে তাঁর বর্তমান এক জন্মের পারমিতা অনুশীলনে ঐ সুন্দর সৃজনে সমর্থ হয়েছিলেন তাও নয়। তথাগত বুদ্ধ তাঁর অনন্ত

অতীত জন্মের পারমিতা পূর্তিজনিত অনন্ত পুণ্যের প্রভাবে শারীরিক দৃষ্টিতে অতুলনীয় রূপের অধিকারী তো হয়েছিলেনই, সাথে আশ্রব, অনুশয়, সংযোজন আদি বাধক বা প্রদূষণকারী সব ধর্মের সমূল বিনাশ সাধন করে তাঁর মানস-জগতকে এমনভাবে কলঙ্কমুক্ত (নিরঞ্জন) সুন্দর করেন যা কোনো কারণে কোন কালে আর দ্বিতীয়বার অসুন্দর হবে না।

মানুষের জীবন কর্মময়। কর্ম তিন প্রকারের, যেমন—মানসিককর্ম, বাণীকর্ম ও কায়কর্ম। ধর্মপদ গ্রন্থের দ্বিতীয় গাথায় উক্ত বুদ্ধবাণী অনুসারে কায়কর্ম ও বাণীকর্ম উভয়েরই সৃষ্টি মানসিক কর্ম অর্থাৎ চিন্তায় হয়। মন যাদের সুন্দর, তাঁদের সুন্দর মন হতে সৃষ্ট বাণীকর্ম ও কায়কর্ম সবই সুন্দর হয়। অর্থাৎ তাঁদের সব কর্মই সুন্দর হয়। তাঁর বা তাঁদের আচরিত প্রত্যেকটি কর্মের আদি, মধ্য ও অন্ত ভাগ কল্যাণকর হয়। তাই সম্যক-সম্বুদ্ধ তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘকে বহুজনের হিতে বহুজনের সুখে এমন ধর্ম প্রচারের আদেশ দিয়েছিলেন যার আদিতে কল্যাণ হয়, মধ্যেও কল্যাণ হয় এবং অন্তেও কল্যাণ সাধিত হয়।^{৪৪} এ নির্দেশ মেনে চলায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘ আজও ঐ অনুত্তর সুন্দর ধর্মের ধারক-বাহক হয়ে আছেন।^{৪৫}

যে যার অধিকারী সে তাই অপরকে দিতে পারে। আর যে যার অধিকারী নয়, সে তা অপরকে দিতে চাইলেও তার পরিণাম বিভ্রান্তিকর ও বিস্ফোটক হবে। ভগবান বুদ্ধ ছিলেন সত্যার্থী, সত্যদ্রষ্টা ও সত্যের প্রতীক। ঐ গুণে তিনি ছিলেন অপার মহাশান্তির অধিকারী। তাই তিনি অপর অপার সত্যার্থী জনসমূহকে ঐ দুর্লভ অকাঁচ্য পরম সত্য ও সুখ-সম্পত্তির অধিকারী করাতে পেরেছিলেন। ঐ গুণে তিনি নিজে সুন্দরের অধিকারী হয়ে অপার জনসমূহকেও দুর্লভ সুন্দরের খোঁজ দিয়েছিলেন। তাঁদের অদুর্লভ, অশাস্ত ও পাপ পঙ্কিল জীবনকে পাপমুক্ত করে সুন্দর (পুণ্যময়) করেছিলেন। তৎকালীন রাজা-প্রজাগণের বহুজনের জনপ্রিয় জননায়করূপে পূজিত হবার ঐতিহাসিক ঘটনাটি বুদ্ধের পরম সত্য, পরম শান্তি ও পরম সুন্দর স্থিতি প্রাপ্ত হবার ঘটনাকে সিদ্ধ করায়।

সম্বোধি প্রাপ্তির সাত বছর পর বুদ্ধ যখন প্রথমবার পিতা শুদ্ধোদনের আগ্রহে রাজগৃহ হতে কপিলাবস্তু গমন করেন তখন রাজকুমার সিদ্ধার্থ-পত্নী যশোধরাও কিছুক্ষণ হতবাক ছিলেন, কারণ সিদ্ধার্থকে এত দিব্য আভ্যামণ্ডিত এর পূর্বে আর কখনও দেখেননি। বুদ্ধের অপূর্ব রূপসৌন্দর্যে সম্মোহিত হয়েছিলেন। শেষে পুত্র রাহুলকে তাঁর পিতার পরিচয় করিয়ে দেবার সময় রাহুলমাতা নরসিংহগাথা গেয়ে বুদ্ধের দেহে বিদ্যমান মহাপুরুষের বত্রিশ প্রকার লক্ষণসমূহ একে একে দেখিয়ে দিয়েছিলেন^{৪৬} বুদ্ধের ঐ অপরূপ রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে রাহুলও নিজের অজান্তে পিতা বুদ্ধের পিছু পিছু নিগ্রোধারাম অবধি অনুগমন করেছিলেন। শেষে বুদ্ধের নির্দেশে সারিপুত্রের সান্নিধ্যে মাত্র তের বছর বয়সেই রাহুল শ্রামণের-ধর্মে প্রব্রজিত হয়েছিলেন।

বুদ্ধের অমৃতক্ষরা ধর্ম শ্রোতাদের মধ্যে এমনও কিছু শ্রোতা থাকতেন যারা তাঁর রূপগুণে মোহিত হয়ে ধর্ম শোনার কাজ ভুলে যেতেন। অপলক নেত্রে তাঁরা বুদ্ধরূপের দিকে একনাগাড়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতেন। আবার এমনও কিছু শ্রোতা থাকতেন যাঁরা ধর্মসভার পেছনে বসে শাস্ত্রকে দেখে মোটেই তৃপ্তি পেতেন না। তাই তাঁরা প্রতিদিন একটু একটু করে এগিয়ে আসতেন শাস্ত্রের আসনের কাছে। বুদ্ধকে হাতের নাগালে সাক্ষাৎ দেখেও বুদ্ধ-দর্শনের তৃপ্তি তাঁদের হতো না। তাঁদের ইচ্ছে হতো আরো দেখার, আরো দেখে থাকার। তাঁরা ভাবতেন এভাবে বুদ্ধের প্রতি একাগ্র চিন্তে অনিমেষ নেত্রে তাকাতে পারাটাই বোধ হয় প্রকৃত বুদ্ধপূজা। এতেই বোধ হতো তাঁদের মুক্তি হবে। তাঁদের এমন মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সতর্ক করে শাস্ত্রকে বলতে হতো “এভাবে আমার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থেকে প্রকৃত বুদ্ধপূজা হয় না। যাঁরা ধর্মকে জানেন এবং তদনুসারে আচরণ করেন তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধপূজা করেন।”^{৪৭} এ দেহও তোমাদের ন্যায় বত্রিশ প্রকারের অশুভ তত্ত্বে পরিপূর্ণ।” আবার কখনো তাঁকে বলতে দেখতে পাই যাঁরা প্রকৃতপক্ষে প্রতীতাসমূৎপাদ-নীতিকে জানেন, তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে ধর্মকে জানেন বা পূজা করেন। অর্থাৎ তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধকে ভালবাসেন বা পূজা করেন। এমন শ্রোতাদের মধ্যে বক্কলি অন্যতম। তিনি শ্রাবস্তীরই এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। তিনি বেদ-বেদাঙ্গে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। একদিন তিনি পথে ভগবান বুদ্ধকে প্রথমবার দেখেন। ভগবান বুদ্ধের অপরূপ রূপে এতই মোহিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি মস্তমুগ্ধ হবার ন্যায় অজান্তে শাস্ত্রের পেছনে পেছনে চলে জেতবন বিহারে প্রবেশ করেন।

শাস্ত্রের ধর্মদেশনা দান কালে ঐ বক্কলিও সামনে বসেছিলেন, তবে দেশনা শোনার জন্যে নয়, কেবলমাত্র বুদ্ধের রূপ-দর্শনের জন্যে। শাস্ত্রা যতক্ষণ ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন, ততক্ষণ বুদ্ধের দিকে তাকিয়েছিলেন। এতেও তৃপ্তি না পেয়ে ঐ বক্কলি সারাদিন সারাক্ষণ মনপ্রাণ জুড়ায় এমন মতো কাছে বসে বুদ্ধকে দেখার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে ভিক্ষু-ধর্মে দীক্ষা নেন।

ভিক্ষু হয়েও ঐ বক্কলি তাঁর ভিক্ষান্ন সংগ্রহের, ভিক্ষান্ন গ্রহণের এবং স্নানের সময়টুকু ছাড়া তাঁর দিন-চরিয়ার শেষ সময় বুদ্ধের দিকে তাকিয়েই কাটাতে থাকেন। বক্কলির এ মিথ্যাদৃষ্টিপূর্ব মনোদশার দুঃসংসারের কথা জানতে পেরে শাস্ত্রা তাঁকে বলেন— ‘হে বক্কলি! যিনি ধর্মকে জানেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধকে দেখেন (যো খো ধম্মং পস্‌সতি সো মং পস্‌সতি)। তা সত্ত্বেও বক্কলি বুদ্ধের কথায় কান না দিয়ে পূর্বের ন্যায় বুদ্ধের বর্ষাবাস যাপনের শেষ দিন অবধি ওভাবেই তাকিয়ে থাকতেন। শাস্ত্রা বক্কলির ভূত-ভবিষ্যৎ জেনে তাঁর আধ্যাত্মিক প্রগতির পথ প্রশস্ত করার এবং নিজের তীব্র অসন্তুষ্টি-ভাব ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে বক্কলিকে নির্দেশ দেন যেন সে আর তাঁর ধর্মযাত্রায় অনুগমনকারী না হয়।

শাস্তার এমন অপ্রত্যাশিত নির্মম ব্যবহারে যার-পর-নেই মর্মান্তিক বেদনায় আহত হয়ে গৃধকূটের পর্বত প্রপাতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হবেন ঠিক ঐ সময় বুদ্ধ দিব্যদৃষ্টিতে তা জানতে পেরে ঋদ্ধিশক্তির প্রভাবে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হন। আধ্যাত্মিক সংবেগদায়ক একটি গাথা বলেন। তার উত্তরে বকলি চারটি জ্ঞানের উৎকর্ষতাসূচক চারটি গাথা উচ্চারণ করেন। ভগবান বুদ্ধ তাঁর আধ্যাত্মিক মনোদশা জানতে পেরে হাত বাড়িয়ে ‘এসো ভিক্ষু’ বলে কাছে আসার আমন্ত্রণ জানান। এতে অত্যাধিক প্রীত-প্রফুল্লিত হয়ে বকলি অরহত্ব-ফলে প্রতিষ্ঠিত হন এবং আকাশে স্থিত হয়ে বুদ্ধের প্রতি প্রণাম জানান।

এর পর ভগবান বুদ্ধ এক সঙ্ঘ-সভায় ঘোষণা করেন—ঋদ্ধাধিক্যের কারণে অর্হৎ হয়েছেন (সদ্ধাধিমুত্তানং) এমন শিষ্যগণের মধ্যে বকলি অগ্রগণ্য।^{৪৮}

এ প্রসঙ্গে এটি উল্লেখনীয় যে বুদ্ধ কখনই ব্যক্তিপূজাকে প্রাধান্য দেন নি। ব্যক্তিপূজার চেয়ে সঙ্ঘপূজাকেই অধিক গুরুত্ব দিতেন। একবার বুদ্ধের মাসীমা মহাপ্রজাপতি গৌতমী নিজ হাতে বুদ্ধের জন্যে মহার্ঘ চীবর বানিয়ে বুদ্ধের হাতে তুলে দিতে এসেছিলেন। ঐ সময় শাস্তা মাসীমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁকে না দিয়ে অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে দান করতে।^{৪৯}

বুদ্ধকে দৈহিক যে বত্রিশ প্রকার লক্ষণসমূহের কারণে মহাপুরুষরূপে চিহ্নিত করা হয়েছিলো তার মধ্যে চক্রাক্ষিত পা এটি অন্যতম। এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ঘটনাটি উল্লেখনীয়।

একবার ভগবান বুদ্ধ তাঁর ধর্মযাত্রাকালে কুরু জনপদে যান। তখন তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কুরু জনপদবাসী ব্রাহ্মণ মাগন্দিয়ের আবাসস্থলের কিছু দূরেই এক গাছের নীচে বসে ধ্যানস্থ ছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ মাগন্দিয় তাঁদের পরম্পরাগত বৈদিক শাস্ত্রে পারঙ্গত হবার সাথে লক্ষণ-শাস্ত্রেও অভিজ্ঞ ছিলেন। ব্রাহ্মণ মাগন্দিয়ের একমাত্র কন্যার নাম মাগন্দিয়া। মাগন্দিয়া ছিল এক অপরূপা সুন্দরী। নিজের রূপে সে ছিলো প্রচণ্ড রূপগর্বিনী। নিজেকে যে বিশ্বসুন্দরীর চেয়ে কম কিছু মানতো না। লোকমুখে সে বুদ্ধের রূপসৌন্দর্যের কথা শুনেছিলো। তবে তাঁকে চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য তার এতদিন হয়নি। তাই তাঁকে সে নিজের সমকক্ষ ভাবতে কিছুতেই প্রস্তুত ছিলো না। একারণে বোধ হয় মাগন্দিয়া তা ভাবতে পারেন নি। হঠাৎ যাত্রাপথে অপরূপ দেবধারী যুবক সন্ন্যাসীকে দেখে মাগন্দিয়া হতবাক হয়ে যায়। ইনিই যে সমাজে অতি খ্যাত বুদ্ধ তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। তাই তাঁকে দেখামাত্রই তাঁর মাগন্দিয়ের একমাত্র যোগ্যপাত্র মনে করেন।

আর কালবিলম্ব না করে তিনি তাঁর মেয়ের পাণি গ্রহণের প্রস্তাব দিয়ে ফেলেন। তখন শাস্তা সুগত বুদ্ধ স্থিত হেসে নীরব রইলেন। তাঁর নীরবতাকে মৌনসম্মতি মেনে নিয়ে ব্রাহ্মণ মাগন্দিয় বাড়ী এসে তাঁর পত্নী ও মেয়েকে নিয়ে যান ঐ স্থানে।

তঁারা পৌঁছানোর পূর্বেই বুদ্ধ ইচ্ছাকৃতভাবে মাটিতে এমনভাবে চাপ দেন যাতে তাঁর পায়ে অঙ্কিত চক্রচিহ্নের ছাপ পড়ে। এর পর সুগত বুদ্ধ সেখান থেকে অন্যত্র চলে যান আর ধ্যানস্থ হন।

পূর্বস্থানে কাউকে দেখতে না পেয়ে তঁারা হতাশাশ্বিত হয়। তখনই হঠাৎ চক্রাঙ্কিত পদচিহ্নটি মাগন্দিয়ের দৃষ্টিগত হয়।^{৫০} মাগন্দিয় বুঝতে পারেন এ লক্ষণসম্পন্ন পুরুষ নিশ্চয়ই কোনো অসাধারণ মহাপুরুষ হবেন। ইনি কিছুতেই পুনরায় গৃহী হতে পারেন না। একথা বোঝানো সত্ত্বেও মাগন্দিয়া পিতাকে নিয়ে ঐ যুবকের খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। শেষে অন্যত্র বুদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ হয়। মাগন্দিয়ার বিয়ের প্রস্তাবে বুদ্ধ বলেন “দেখ মাগন্দিয়া, বোধিবৃক্ষতলে মারবিজয়কালে তোমার চেয়েও শতসহস্রগুণে সুন্দরী রূপসী মারকন্যাদের বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি। তুমি তো তাদের তুলনায় বিষ্ঠাৎ^{৫১}।”^{৫২} এ কথা বলে শাস্তা সুগত বুদ্ধ অন্যত্র এগিয়ে যান।

নিরোধ সমাপত্তি-ধ্যান^{৫৩} হতে সদা উথিত সম্যক্ সম্বুদ্ধের যে অতুলনীয় দিব্য আভ্যামণ্ডিত রূপ থাকে তার তুলনায় মাগন্দিয়া কেন, কোন দিব্য অপরূপা অঙ্গরার সৌন্দর্যই তুলনীয় হতে পারে না। নৈর্বাকিক বিমুক্তিরসের শাস্তি ও সৌন্দর্যের তুলনায় তো প্রশ্নই উঠে না। বুদ্ধের রূপসৌন্দর্যের কাছে এ ধরনের অনেক রূপগবিনী তার রূপের গর্ব খর্ব হয়ে খান খান হয়েছে।

কোশল জনপদের বিশেষত এর রাজধানী শ্রাবস্তীর জনগণ সমকালীন ভারতবর্ষের অন্যান্য জনপদবাসীদের চেয়ে বুদ্ধের প্রতি অধিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। সেখানকার শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ড তঁার ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে রাজগৃহে আসলে সেখানকার শীতবন বিহারে ভগবান বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে শ্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হন। শাস্তা সুগত বুদ্ধকে শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ড শ্রাবস্তীতে থাকার অনুরোধ করেন। শাস্তা সম্মতি দিলে অনাথপিণ্ড চুয়ান্নকোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে কুমার জেতের উদ্যানভূমি ক্রয় করে জেতবনারাম তৈরি করান। এতে ভগবান বুদ্ধের বাসযোগ্য করে একটি পৃথক কুটিরও তিনি তৈরি করিয়েছিলেন। মহার্য্য রূপে-পুষ্পর মনমোহক গন্ধে সর্বদা সুগন্ধিত থাকায় ঐ কুটিরের নাম রাখা হয়েছিল “গন্ধকুটি”। জেতবনারাম তৈরির পরবর্তীকালে পূর্বারাম সহ আরো অনেক বিহার বা আরামে শাস্তা সুগত বুদ্ধ বিহার করেছিলেন, তবে তিনি অধিকাংশ (পঁচিশটি) বর্ষাবাস কাটিয়েছিলেন ঐ জেতবনারামের গন্ধকুটিতে।^{৫৪}

বহুজনের হিতে বহুজনের সুখে বুদ্ধকে তাঁর বুদ্ধচর্যা পালনের সুবিধার্থে দূরদূরন্তবর্তী নানা জনপদে যেতে হতো। ঐ অবসরে ভগবান বুদ্ধের অনুপস্থিতি শ্রাবস্তীবাসীকে বড়ই প্রিয়জন-বিয়োগ-জনিত পীড়া ভোগ করতে হতো। বুদ্ধ ক্রমাশ্রয়ে অধিককাল এক বিহারে অবস্থান না করায়, শ্রাবস্তীবাসীকে বারে বারে বুদ্ধকে না দেখার পীড়া সহন করতে হতো।

শাস্তার অনুপস্থিতিতে বজ্রাসনের শূন্য প্রতিকৃতি, বুদ্ধের চক্রবরাক্ষিত পদচিহ্ন, বোধিবৃক্ষ আদিকে পূজা করা হতো। কিন্তু সাক্ষাৎ বুদ্ধকে পূজা করার, চোখে দেখার, সেবা-শ্রদ্ধা করার যে অপার পুণ্যপ্রসাদ পাওয়া যায় তা হতে শ্রাবস্তীবাসীরা বঞ্চিত হতে চাচ্ছিলেন না। শ্রাবস্তীবাসীদের একান্ত ইচ্ছে শাস্তা সুগত বুদ্ধ দীর্ঘকাল তাঁদের শ্রাবস্তীতে, তাঁদের গন্ধকুটিতেই থাকুন।

এ ব্যাপারে শ্রাবস্তীবাসীর হয়ে অনাথপিণ্ড প্রমুখ কিছু প্রতিষ্ঠিত উপাসক-উপাসিকা গন্ধকুটিতে এসে শাস্তার সাথে আলাপ করেন। এ সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে উপাসক-উপাসিকারা প্রস্তাব দিয়ে বলেন “ভগ্নে ভগবান, আপনার অনুপস্থিতিতে আমাদের গন্ধকুটিতে চন্দন-কাঠের তৈরি আপনার মূর্তি^{৬৪} বানিয়ে পূজা করার অনুমতি চাই”। এমন পরিস্থিতিতে শাস্তার আর করার কি থাকে? শেষে বহুজনের হিতে ও বহুজনের সুখে এবং তাঁদের শ্রদ্ধার পরিহানি যাতে না হয় তার জন্যে শাস্তাকে মৌনতা অবলম্বন করতে হয়। চন্দন-কাঠের বুদ্ধমূর্তি তৈরি করানো হয়। বুদ্ধের অনুপস্থিতিতে বুদ্ধমূর্তির পূজা করা হতো। মনুষ্যলোকে বুদ্ধমূর্তি তৈরির খুব সম্ভবত এটিই প্রথম ঘটনা।^{৬৫} পরবর্তীকালে এক ইদুরের উৎপাতে ঐ গন্ধকুটিতে আগুন লাগায় ঐ চন্দন-কাঠের বুদ্ধমূর্তি জ্বলে যায়।

এ ছাড়া আর একটি প্রসঙ্গ রয়েছে সেখানে বুদ্ধ নিজেই নিজের প্রতিমূর্তি করেছিলেন। সিদ্ধার্থের জন্মের সাতদিন পর তাঁর মা মহামায়াদেবী মারা যান। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর সপ্তম বর্ষাবাসের পূর্বে জানতে পারেন তাঁর মা মহামায়াদেবী মৃত্যুর পর তাবতিংস-দেবলোকে তুষিত দেবপুত্র হয়ে জন্মেছেন। শাস্তা সুগত বুদ্ধ ছিলেন একজন কৃতজ্ঞ পুরুষ। বর্তমান বা অতীত জীবনের যে কোনো অবস্থায় যার মাধ্যমেই তিনি উপকৃত হয়েছেন সময় পেলেই ঐ উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রত্যুপকার করেছেন। এ ধরনের ঘটনা বুদ্ধের জীবনে অনেক রয়েছে।

স্বর্গীয়া মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য পালনের জন্যে তিনি তুষিতভাবে সপ্তম বর্ষাবাস যাপন করেন। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় মহামানব বুদ্ধ এক শ্রেষ্ঠ সন্তানরূপে তাঁর মাকে (দেবপুত্র) তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ অভিধর্মের প্রথম দেশনা দিয়ে শ্রেষ্ঠ উপহার দিয়েছেন (ধম্মদানং সৰ্বদানং জিনাতি)। তা সে ভিন্ন ব্যাপার। বুদ্ধমূর্তি তৈরির সাথে এর কি সম্বন্ধ? কোন স্থূল-আহার-ভোজীর পক্ষে ক্রমাগত তিনমাস দেবলোক-ব্রহ্মলোকের কোথাও থাকা সম্ভব নয়। দেবলোকে-ব্রহ্মলোকে মনুষ্যলোকের স্থূল-আহার পাওয়া যায় না। কারণ সেখানকার নিবাসীরা সূক্ষ্ম-আহার ভোজী হন। তদুপরি স্থূল-আহারে পুষ্ট দেহীর প্রাতকৃত্য, স্নান, আহার-সংগ্রহের বা পিণ্ডাচরণ করার সুবিধা নেই দেবলোকসমূহে। একারণে তিনি প্রতিদিন পূর্বাহ্নে এক নিশ্চিত সময়ে হিমবন্ত প্রদেশে আসতেন। অভিধর্ম-পিটকের বিষয়বস্তু আকারে ও গভীরতায় অন্য দু’টি পিটক থেকে

অধিকতর। তাই প্রতিদিন তাঁর অনুপস্থিতিতেও ফিরে না আসা অবধি অভিধর্মের দেশনা নিরন্তর যাতে চলতে থাকে তার জন্যে তিনি ঋদ্ধিশক্তির প্রভাবে তাঁর নিজের অবিকল প্রতিমূর্তি বানিয়ে প্রতিদিন এক নিশ্চিত দেশনাটুকু চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে মনুষ্যালোকে আসতেন।^{৬৬} তবে এভাবে প্রতিমূর্তি তৈরির উদ্দেশ্য ব্যক্তিপূজা নয়, তা ছিল বর্ষাবাসকালীন সীমিত সময়ের সর্বাধিক প্রয়োগের এক উপায়-কৌশল্য। এ ছাড়া পরবর্তীকালে পুণ্যার্থীগণের প্রতিদিন প্রতিক্ষণ এমন কি অনিবার্ণকাল অবধি পুণ্যবর্ধন হয়। এমন যে কয়টি কাজের কথা শাস্ত্রা সুগত বুদ্ধ বলেছিলেন এর মধ্যে বুদ্ধমূর্তি সহ বিহার বা আরাম তৈরি অন্যতম।

অপ্রসন্নগণের মনে প্রসন্নতা উৎপাদন এবং প্রসন্নগণের প্রসন্নতার মাত্রা বাড়ানোই বুদ্ধ, ধর্ম ও তাঁর সঙ্ঘের প্রমুখ লক্ষণ।^{৬৭} ঐ দৃষ্টিতে বুদ্ধমূর্তি তৈরিরও ঐ একই লক্ষ্য ও লক্ষণ থাকা উচিত। যে কোনো আরাধ্য দেব-দেবীর চিত্র সাধারণত বালি, মাটি, কাগজে বা কাপড়ে করা হয়। মূর্তির নির্মাণ সাধারণত মাটি, কাঠ, পাথর দিয়ে তৈরি করা হয়। বুদ্ধমূর্তি তৈরির বেলায়ও ওসবের প্রয়োগ পৃথক পৃথক ভাবে করা হয়েছে। মাটির চেয়ে কাঠ খোদাই করা কষ্টকর। আবার কাঠের চেয়ে পাথর খোদাই করা ততোধিক কষ্টকর কাজ। এর চেয়েও কষ্টকর, শ্রমসাপেক্ষ ও সূক্ষ্ম স্ফটিক মণি-রত্ন ও কৃত্রিম মিশ্রিত ধাতুতে বুদ্ধমূর্তি তৈরি করা।

কোন শিল্পীর কাছে এক সাধারণ মানবের মূর্তি তৈরির চেয়ে অসাধারণ মানবের (বুদ্ধের) মূর্তি তৈরি করা একটি দুষ্কর কাজ। আরাধ্য দেব-দেবীর মূর্তি বানাতে শিল্পীকে ততটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। কারণ, ওসবের সব ক'টিই কাল্পনিক। কাল্পনিক হওয়ায় ওসবের মূর্তি তৈরির বেলায় শিল্পী তার কাল্পনিক শক্তির ডানা মেলে যথেষ্টা উড়তে পারেন। শিল্পী নিজের চোখে যা নয়াকর্ষক মনে করেন সেভাবে মূর্তিটিকে সুন্দর করার প্রয়াস করে থাকেন। কিন্তু বুদ্ধমূর্তি তৈরির বেলায় শিল্পীর ততটা স্বাধীনতা থাকে না। কারণ সম্যক-সম্মুদ্রের শারীরিক (অঙ্গ-অবয়বের) লক্ষণগুলো শাস্ত্রজ্ঞ জ্যোতিষাচার্যকগণের কাছে সুস্পষ্ট। কিন্তু শিল্পীদের কাছে তা স্পষ্ট নয়। ছোট শিশুর মূর্তি তৈরিকালে শিল্পীকেও শিশুসুলভ হতে হয়। বয়স্কের মূর্তি তৈরিকালে শিল্পীকে বয়স্কের মতো হয়ে মূর্তি তৈরী করতে হয়। যোদ্ধার মূর্তি তৈরীকালে শিল্পীকে যোদ্ধার মতো হয়ে মানসিকভাবে তৈরি হতে হয়। কোন আদর্শ মায়ের মূর্তি তৈরি করাকালে শিল্পীকেও মাতৃবৎ হতে হয়। অনুরূপভাবে বুদ্ধমূর্তি তৈরিকালে শিল্পীকে বুদ্ধের গুণাবলী জেনে বুদ্ধময় হতে হয়। বুদ্ধমূর্তিকে শুধু নয়নাকর্ষক করে তুললেই হয় না। তাঁকে বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ ও আশি প্রকার অনুব্যঞ্জন লক্ষণ ঐ মূর্তিতে ফুটিয়ে তুলতেই হয়। তা না হলে যে বুদ্ধমূর্তি আরো নয়নাকর্ষক হয়ে দর্শকের হৃদয়স্পর্শী হয়। এ ছাড়া মূর্তির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা নির্ধারণেরও বিধি-বিধান রয়েছে। তাই

এসব করতে শিল্পীকে অধিকাধিক শ্রমদানের ও ধৈর্যের অধিকারী হতে হয়। শিল্পী তার শ্রম ও সময়, শিল্প-নৈপুণ্যতা দান করলেও মূর্তি তৈরির মাটি, কাঠ, পাথর, শুদ্ধ বা মিশ্রিত ধাতু বা মণি-রত্নাদি অর্থ ছাড়া সুলভ হয় না। তাই একাজে বিত্ত বা বিত্তবানেরও প্রয়োজন হয়। আরো প্রয়োজন হয় ‘চিরং তিট্ঠতু বুদ্ধ-সাসনং’ মানসে সদ্ধর্ম প্রচার-প্রসারে ইচ্ছুক অধিক ধনবান-ধনবতী, শ্রদ্ধাবান-শ্রদ্ধাবতী উপাসক-উপাসিকার।

মানুষের জীবন-যাপন শৈলী বা মুদ্রা চার প্রকারের—দাঁড়ানো, গমনশীল, বসা ও শোয়া।^{৭৮} তাই বুদ্ধের প্রাচীন মূর্তি ও চিত্রসমূহ খুব সম্ভবত ঐ চার প্রকার মুদ্রায় (শিল্পশৈলী বা মূর্তিকালয়) তৈরি হতো। প্রারম্ভিক স্তরে বসা ও শোয়া মুদ্রায় বুদ্ধের মূর্তি তৈরির প্রচলন ছিলো বলে মনে হয়। পরে চাহিদা অনুসারে দাঁড়ানো ও চলমান মুদ্রায় বুদ্ধের মূর্তি তৈরির প্রচলন হয়। বসা বুদ্ধমূর্তিও আবার মুদ্রাভেদে অনেক প্রকারের, যেমন—দুষ্কর তপশ্চর্যারত বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ, বুদ্ধের সম্বোধি প্রাপ্তি সূচক ধ্যান-মুদ্রা, ভূমিস্পর্শ-মুদ্রা, অভয়-মুদ্রা, পদ্মাসন-মুদ্রা, সুখাসন-মুদ্রা, ধর্মচক্র-মুদ্রা আদি। শোয়া-মুদ্রার উদাহরণস্বরূপ কুশীনারার বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ (সিংহ) শয্যা উল্লেখযোগ্য। আজকাল আরও নানা মুদ্রায় বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়, যেমন ডান হাত উঁচিয়ে পদ্মফুলে দাঁড়ানো সিদ্ধার্থের (জন্ম সূচক) মূর্তি, বরদ বা অভয় মুদ্রায় বুদ্ধের দাঁড়ানো মূর্তি আদি।

পরবর্তীকালে সঙ্ঘ-বিভাজনের পর মহাযান ও বজ্রযানের প্রকার-প্রসার খুব জোরে-সোরে হয়। আত্মমুক্তি প্রাপ্তির চেয়ে অন্যকে মুক্তি-দানের উদ্দেশ্যকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের প্রভাবকে অধিক শক্তিশালী ও স্থায়ী করে তোলার উদ্দেশ্যে তাঁদেরকে লোকান্তর পুরুষ ভাবা হয়। সহজে সমস্যা মুক্ত হবার বা অপরকে মুক্ত করানোর এবং লৌকিক বা অলৌকিক সিদ্ধি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নানাবিধ তন্ত্র-মন্ত্র-যন্ত্র ও ধারণার প্রচলন করা হয়। এভাবে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব-এর সাথে আরক্ষা প্রদানকারী লোকপাল যক্ষ-যক্ষিণীর মূর্তি তৈরির প্রচলনও ব্যাপক হারে চলতে থাকে। পরে পরে হীনযানী বা থেরবাদী পরম্পরায়ও বুদ্ধমূর্তি তৈরি ও পূজার পরম্পরা আরো বেশীভাবে সংক্রমিত হয়। আরো পরে মহাযান সম্প্রদায়ের সম্প্রসারণ ও শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ায় বুদ্ধের মূর্তির সাথে ত্রিলোকনাথ (মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর, বজ্রপাণি) -এর এবং বুদ্ধ-পরিবারের (মণ্ডলী) অন্তর্ভুক্ত প্রমুখ শিষ্য (শারীপুত্র, মৌদগল্যায়ণ, মহাকাশ্যপাদি), প্রমুখ দেব-দেবীর মূর্তিও স্থান পায়। বুদ্ধমূর্তি অধিকাধিক নির্মাণের মাধ্যমে একদিকে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা ও স্থায়ীত্ব বেড়েছে বৈকি, তবে মূর্তিরূপে বুদ্ধকে কাছে পেয়ে নিজেকে প্রবুদ্ধ করার প্রবণতাটা যেন আমরা ভুলতে বসেছি।

বৌদ্ধধর্ম সম্প্রসারণের সাথে সাথে ভারত ও ভারতের পার্শ্ববর্তী পাকিস্তান,

আফগানিস্তান, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, চীন, তিব্বত, তাইওয়ান, মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া, জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, সাইবেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া আদি দেশসমূহে নিজ নিজ শিল্প-সংস্কৃতি অনুসারে আকর্ষক ছোট-বড় ও বিশাল আকারের বুদ্ধমূর্তি তৈরির প্রকল্প চলছে। তাই প্রত্যেক দেশের তৈরি বুদ্ধমূর্তির এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে যেমন মথুরা-শিল্প, গান্ধার-শিল্প ইত্যাদি।^{৫৯} একসময় পাহাড়-পর্বতের দেয়াল কেটে গুহা-গহ্বর খোদাই করে গুহা-গুহুর-গাত্রে বুদ্ধমূর্তি তৈরি করা হতো। এমনও কিছু দেশ আছে সেখানে আজ পুরো পাহাড়কেই বুদ্ধের আকার দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি জার্মানিতে United Sand Festival (USF) কর্তৃক আয়োজিত এক আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতায় Solo Sand Sculpture-এর শ্রেণীভুক্ত শুধুমাত্র বালিতে তৈরি ধ্যানমূর্তায় আসীন বুদ্ধমূর্তিটি সর্বোত্তম পুরস্কার প্রাপ্তির স্বীকৃতি পেয়েছে।

প্রারম্ভিক পর্যায়ে বুদ্ধমূর্তির পূজা দুভাবে হতো-নিরামিষ পূজা ও আমিষ পূজা। পরবর্তী পর্যায়ে বুদ্ধমূর্তির সৃজন, শুধুমাত্র (আমিষ) পূজা-অর্চনা করা বা বুদ্ধকে ধ্যান-সমাধির আলম্বন (কর্মস্থান)-রূপে ব্যবহার (নিরামিষ পূজা) করার উদ্দেশ্যেই হত না, দু'টি ব্যক্তি, দু'টি পরিবার ও দু'টি দেশের রাজপরিবারের প্রশাসকীয় স্তরের মধ্যে আত্মিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক সম্বন্ধকে পূর্বাপেক্ষা প্রগাঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী করে তোলার উদ্দেশ্যেও বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ ও আদান-প্রদান করা হতো। এমন ঘটনা সমূহের উল্লেখ নানা দেশের বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তিব্বতের একটি ঘটনা এখানে বড়ই প্রাসঙ্গিক। ঘটনাটি ৭ম খৃস্টাব্দের ঘটনা। তখনকার ৩৩তম তিব্বতী রাজা ছিলেন Sontsen Gampo। তিনি ছিলেন এক দক্ষ যোদ্ধা ও প্রশাসক। তাঁর রাজত্বের প্রসার বঙ্গ ও মিথিলাঞ্চল অবধি হয়েছিলো বলা হয়। প্রতিবেশী নেপাল ও চীন সব সময়ই কখন ঐ রাজার মাধ্যমে আক্রান্ত হবে এ দুশ্চিন্তায় ভ্রান্ত থাকতেন। রাজা Sontsen Gampo-এর তিনটি রাজরাণী ছিলো। তা সত্ত্বেও নেপাল নরেশ ও চীনা নরেশের কাছে তাঁদের মেয়ে যথাক্রমে Bharkuti Devi এবং Wencheng -কে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। এখানে স্মরণীয় যে নেপাল ও চীনের দুই রাজ-পরিবারই ছিলো বৌদ্ধ।

তিব্বতের ঐ রাজা অত্যাধিক মহত্ম্যাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তদুপরি তাঁর দৈন্যশক্তিও অধিকতর শক্তিশালী ছিলো। তাই ঐ সব নানা রাজনৈতিক কারণে তাঁরা তিব্বত রাজার বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারেন নি।

নেপাল নরেশের মেয়ে Bharkuti Devi ও চীন নরেশের মেয়ে Wencheng নিজ নিজ দেশ হতে শ্বশুরালয় (তিব্বত) যাবার কালে স্বদেশীয় রাজ পরিবারের চিরাচরিত ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতীকরূপে এক এক বুদ্ধমূর্তি তিব্বতের রাজ-পরিবারে সাথে করে

নিয়ে গিয়েছিলেন। তিব্বতের রাজা তাঁর নব বিবাহিতা দুই পত্নীর সম্মানার্থে তাঁদের আনা দু'টি বুদ্ধমূর্তির যথাযোগ্য পূজা-সংকার প্রদানের উদ্দেশ্যে রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি এলাকায় দু'টি পৃথক বুদ্ধ বিহার (Ramochek The Zokhang এবং Traduk Temple) নির্মাণ করিয়েছিলেন। এভাবে ঐ দুই বিবাহিতা পত্নী ধর্মীয় জীবনের প্রভাবে রাজা Sontsen Gampo-এর নাম অত্যধিক সম্মানের সাথে স্মরণ করা হয়। এভাবে বুদ্ধমূর্তির আনয়ন তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশের এক ঐতিহাসিক সশস্ত্র आधारভূমি প্রদান করেছিলেন।^{৬০}

ব্যবসায়িক স্বার্থেও ধনবানগণ দক্ষ শিল্পীকে দিয়ে নানান আকর্ষক মুদ্রায় বুদ্ধের মূর্তি তৈরি করে থাকেন। বুদ্ধকে কেন্দ্র করে যে মূর্তিশিল্প বা শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি শুরুতে গড়ে উঠেছিলো ওসবের পেছনে স্থবিরবাদী বা মহাযানী আত্ম-নিবেদিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণের অবদান মুখ্য ছিলো। তাঁরা নিজেরাই স্থাপত্য-শিল্প, মূর্তিশিল্প, চিত্রশিল্পে দক্ষ থাকায় ভারতে ও বহির্ভারতে অজস্র, ইলোরার ন্যায় বিশ্বপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ স্থাপত্য-শিল্পের ঐতিহাসিক নিদর্শনের অমিত স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

ভারত হতে মধ্য এশিয়ার দেশ-সমূহ হয়ে Silk Route নামে খ্যাত যে সব পথ তিব্বত-চীন দেশে প্রবেশ করেছে ওসবে প্রাপ্ত বিহার, আরামাদি তৈরি বুদ্ধমূর্তিসমূহ এর জ্বলন্ত উদাহরণ। বার্মা, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, লাওস, ভিয়েতনাম, তাইওয়ান, চীন, তিব্বত আদি দেশে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণের অসংখ্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ওসবে গৃহী শিল্পীদের ও অর্থোপার্জনের সুযোগ হয়েছে। এরও পরবর্তী সময়ে মহাযানী পরম্পরায় বুদ্ধের মূর্তির সাথে পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধের^{৬১} মূর্তিও সংযোজিত থাকে। এভাবে ক্রমশ সহঅবস্থানকারী মূর্তির সংখ্যা বাড়তে থাকে।

বুদ্ধমূর্তি নয়নাকর্ষক হওয়ায় প্রায় দেশেরই সৌন্দর্যপ্রেমীগণ এমন কি অবৌদ্ধরাও তাদের আবাসস্থলের (বৈঠকখানা) শোভা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বাস্তবকারগণের পরামর্শে বুদ্ধমূর্তি রাখেন। আজকাল এ এক নতুন ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ সারাবিশ্বে যেসব আরাধ্য দেব-দেবীর বা জনপ্রিয় নেতাগণের মূর্তি তৈরি করে দেশ-বিদেশে পাঠানো হচ্ছে ওসবের মধ্যে বুদ্ধের মূর্তিই সর্বাধিক। আজকাল ট্যুরিজমের যুগ। মনোরঞ্জনের জন্যে মানুষ ভ্রমণবিলাসীও হয়েছে। ভ্রমণবিলাসী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের এবং প্রকারান্তরে বুদ্ধ-মূর্তিক-শিল্পকে অধিক অর্থকরী করে তোলার উদ্দেশ্যেও সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে নানা আকারের, নানা মুদ্রার নয়নাকর্ষক বুদ্ধমূর্তি তৈরি ও স্থাপনার কাজ আধুনিকযুগে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বনে-অরণ্যে যেখানে বুদ্ধ বা তাঁর আর্য়শ্রাবকগণ বিহার করেন ঐ ভূমিভাগ রমণীয় হয়ে পড়ে।^{৬২} মানুষ তো দূরের কথা, বনের পশুপাখিরাও আহ্লাদিত হয়।

বুদ্ধমূর্তি বুদ্ধেরই প্রতিকৃতি। কাজেই বুদ্ধমূর্তি ঘরে-বাইরে, আরামে বা বিহারে, নগরে বা নিগমে, বনে বা অরণ্যে যেখানেই রাখা হোক না কেন তা সামান্যজনের কাছে মনোরঞ্জনদায়ক হয়। জ্ঞানীজনের কাছে তা মনোরঞ্জনদায়ক হবার সাথে সংবেগদায়কও হয়। কখন তা তাঁদের কাছে বিমুক্তি-সুখ লাভের প্রত্যয় বা প্রেরণা-বিন্দুরূপেও ক্রিয়া করে।

অপেক্ষা ফুল নিজে সুন্দর ও রমণীয় হওয়া অপর দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানুষকে আনন্দদানে যথেষ্ট প্রত্যয়ের ভূমিকা পালন করতে সমর্থ। তবে ঐ ফুলকে ভিত্তি করে কে কতখানি আনন্দ লাভ করবে তা ফুলের আকার, রস, সৌন্দর্যের উপরই সব নির্ভর করে না। তা নির্ভর করে অনেকটা তার ধারক বা দর্শনার্থীর ইন্দ্রিয়শক্তির সূক্ষ্ম সামর্থ্যতার উপর। অনুরূপভাবে বুদ্ধমূর্তি যতই সুন্দর হোক না কেন তা কতখানি অন্যের কাছে আনন্দ বা সংবেগদায়ক হবে তা অনেকটা নির্ভর করে দর্শনার্থীর মন-মানসিকতার উপর। সত্যাত্মবোধ সত্যের খোঁজে বেড়িয়ে পড়ে ক্রমাগত শান্তি (শিবত্ব) ও সুন্দরের প্রত্যক্ষদর্শী হন। এর বিপরীত কেহ আবার সুন্দরের অন্বেষণে বেড়িয়ে শান্তি ও শেষে সত্যের প্রত্যক্ষদর্শী হন।

যেসব শ্রদ্ধালু মানুষ অর্থ, সময় ও সুযোগের অভাবে কোন তীর্থস্থানে যেতে পারেন নি এ অবধি, তাঁদের জন্যে ঘরের দুয়ারে বসে অহরহ তীর্থদর্শনজনিত পুণ্যার্জন করার দুর্লভ সুযোগ আসে। তাঁদের ব্যস্ত জীবনেও খানিকক্ষণ বুদ্ধ-ভাবনায় মগ্ন থাকার, মহাশান্তি-মহাপ্রেমের পরম পাবার অবসর হবে।

ভারত ও বহির্ভারতের বিভিন্নস্থান হতে আগত বিদ্যার্থী, গবেষকগণ এ বুদ্ধমূর্তি দেখার পর স্ব-স্ব স্থানে ফিরে গেলে বিশ্বশান্তি স্থাপনায় বুদ্ধের মহান মৈত্রীময় অহিংসা-বাণী প্রচারে উদ্বুদ্ধ হবেন। বিবিধ বৈষম্যের মাঝে থেকেও বুদ্ধের প্রচারিত সহাবস্থানের মোক্ষম মহামৈত্রীমন্ত্রে অশান্ত বিশ্ববাসীকে একসূত্রে বেঁধে রাখার প্রয়াস তাঁরা করবেন।

ঃ চিরং তিষ্ঠতু বুদ্ধসাসনং :

সমাপ্ত

তথ্যপঞ্জী :

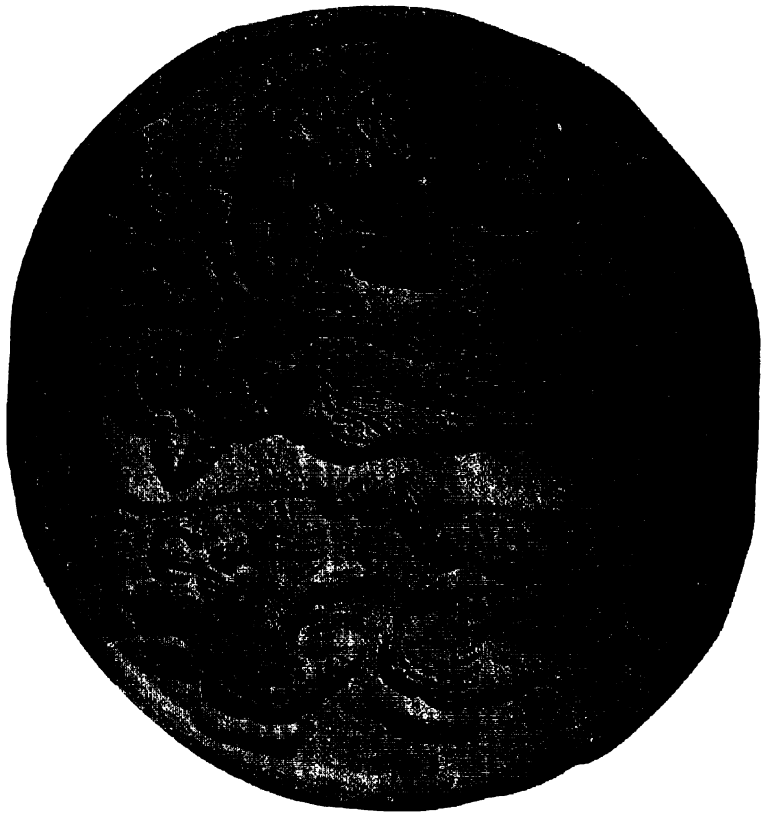
- ১। বুদ্ধাভিহিত বুদ্ধো। -
- ২। জাতক নিদান (অনুবাদ), ধর্মপাল ভিক্ষু, বৌদ্ধ ধর্মাকুর বিহার, কলিকাতা, ১৯৬২ইং, পৃঃ ৭৩। জাপানী বৌদ্ধ চিত্রকরেরা ঐ পরম্পরার উপর নবজাতকের শিক্ষাপদ দানের চিত্রপাঠ রচনা করেছেন। তার নান্দনিক কলায় শিশু গৌতম বুদ্ধের লাক্ষণিক দিকগুলিও প্রস্ফুট হয়েছে।
- ৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৪।
- ৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।
- ৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৫।
- ৬। রামদ্বিজ, ধ্বজ, মন্ত্রী, কৌণ্ডিন্য, লক্ষণ, সুয়াম, সুদান্ত ও ভোজ (জাতক নিদান (অনুবাদ), ধর্মপাল ভিক্ষু, বৌদ্ধ ধর্মাকুর বিহার, কলিকাতা, ১৯৬২ ইং, পৃঃ ৭৬)।
- ৭। জাতক নিদান (অনুবাদ), ধর্মপাল ভিক্ষু, বৌদ্ধ ধর্মাকুর বিহার, কলিকাতা, ১৯৬২ইং, পৃঃ ৭৭।
- ৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭-৭৮। -
- ৯। ধর্মপদ অর্থকথা; ললিতবিস্তর এবং বুদ্ধচরিত গ্রন্থে বলা হয়েছে 'সর্বার্থসিদ্ধ' অর্থই সিদ্ধার্থ।
- ১০। যশোধরার পিতার নাম ছিলো দণ্ডপাণি শাক্য। মতান্তরে সুপ্রবুদ্ধ। দেবদত্ত ছিলেন যশোধরার ভ্রাতা।
- ১১। জাতক নিদান (অনুবাদ), ধর্মপাল ভিক্ষু, বৌদ্ধ ধর্মাকুর বিহার, কলিকাতা, ১৯৬২ইং, পৃঃ ৮৪।
- ১২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯০।
- ১৩। পবজ্জাসুত্ত (মহাবর্গ, সুত্তনিপাত, হিন্দি অনুবাদ, ড. ভিক্ষু ধর্মরক্ষিত, মতিলাল বারাণসিদাস পাবলিশার্স, ১৯৯৫ইং।
- ১৪। জাতক নিদান (অনুবাদ), ধর্মপাল ভিক্ষু, বৌদ্ধ ধর্মাকুর বিহার, কলিকাতা, ১৯৬২ইং, পৃঃ ৯৩; পবজ্জাসুত্ত (মহাবর্গ, সুত্তনিপাত, হিন্দি অনুবাদ, ড. ভিক্ষু ধর্মরক্ষিত, মতিলাল বারাণসিদাস পাবলিশার্স, ১৯৯৫ইং); সুত্তনিপাত অর্থকথা।
- ১৫। ধর্মপদ-১১/৭০।
- ১৬। কথিত আছে গয়া নামে এক রাজা এখানে এক যজ্ঞ করেছিলেন। এ যজ্ঞে প্রচুর পরিমাণে অশ্বাদি পশু দান করেছিলেন। এতে গয়াবাসী প্রীত হয়ে বরদান করে বলেছিলেন—এ শহর পরে তোমার নামে প্রসিদ্ধ হবে। এ কারণে অনেকে শক্তি ও সমৃদ্ধি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এখানে এসে যজ্ঞ করে থাকেন।

- ১৭। নবগঠিত ঝাড়খণ্ডে ছাতরা জেলার পার্বত্য অঞ্চল হতে উৎপন্ন জলধারা জেলা হাজারীবাগ, বিহারের গয়া, জাহানাবাদ জেলা হয়ে প্রবাহিত হয় এবং পুনপুন নদীতে মিলিত হয়ে সবশেষে পাটনার কাছাকাছি ত্রিবেণী (গঙ্গা, সোন, পুনঃপুনঃ নদীর) সঙ্গম-স্থলে মিশে যায়। এটি স্থানীয় লোকদের উচ্চারণভেদে নীলাজল, ফল্গু, পুনপুন নামেও জানা যায়।
- ১৮। আর্য্যপর্য্যেণ সূত্র, মধ্যম নিকায়, প্রথম খণ্ড।
- ১৯। বোধিরাজকুমার-সূত্র, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড।
- ২০। প্রাগুক্ত।
- ২১। পধানসুত্তং (মহাবর্গ, সুত্তানিপাত, হিন্দি অনুবাদ, ড. ভিক্ষুরক্ষিত, মতিলাল বারাগসিদাস পাবলিশার্স, ১৯৯৫ইং)।
- ২২। বোধিরাজকুমার-সূত্র, মধ্যম নিকায়, দ্বিতীয় খণ্ড।
- ২৩। জাতক নিদান (অনুবাদ), ধর্মপাল ভিক্ষু, বৌদ্ধ ধর্মাকুর বিহার, কলিকাতা, ১৯৬২ইং, পৃঃ ৯৬-৯৮; সুজাতার পিত্রালয় ছিলো সেনানী গ্রামে এবং পিতা সেনানীর নামানুসারেই এ গ্রামের নামকরণ করা হয়। পালি সাহিত্যে সেনানী গ্রাম সেনা-নিগম নামেও উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর অর্থ সেনা-নিবাস (প্রপঞ্চসূদনী, মধ্যমনিকায় অর্থকথা)।
- ২৪। জাতক নিদান (অনুবাদ), ধর্মপাল ভিক্ষু, বৌদ্ধ ধর্মাকুর বিহার, কলিকাতা, ১৯৬২ইং, পৃঃ ৯৫।
- ২৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০০।
- ২৬। জাতক নিদান (অনুবাদ), ধর্মপাল ভিক্ষু, বৌদ্ধ ধর্মাকুর বিহার, কলিকাতা, ১৯৬২ইং, পৃঃ ১০৮।
- ২৭। ইনি সেই ভগবান অরহত (অরি বা সংযোজন সম্যকরূপে হত বা হনন করা অর্থে), সম্যকসম্বুদ্ধ (স্বয়ং সম্যকভাবে বোধিপ্রাপ্ত অর্থে), বিদ্যারচণ সম্পন্ন (জাতিস্মরণজ্ঞান, চ্যুতি-উৎপত্তিজ্ঞান, আসবক্ষয়জ্ঞান ইত্যাদি আট প্রকার বিদ্যা অধিগত এবং পনের প্রকার আচরণ সম্পন্ন বা ভূষিত অর্থে), সুগত (শোভন বা সম্যক প্রকারে নির্বাণে গমন অর্থে), লোকবিদ (সত্ত্বলোক, সংস্কারলোক এবং আকাশলোক সর্বতোভাবে বিদ বা জ্ঞাত অর্থে), অনুত্তর পুরুষদমনকারী সারথী (দম্য পুরুষগণের চাকল ও অদ্যন্তকে দমন করতে সক্ষম অর্থে), দেবমানবের শাস্তা (দেবমানবের ইহপারলৌকিক শিক্ষা প্রদান করেন, উপদেশ দান করেন এবং শাসন-অনুশাসন করেন করতে সক্ষম অর্থে), বুদ্ধ (সকল প্রকার জাগতিক ধর্ম স্বয়ং এবং সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত অর্থে) এবং ভগবান (ভাগ্যবান, ভগ্নবান, ভগযুক্ত, বিভক্তবান, ভক্তমান, ভবসমূহে গমন-বনকারী অর্থে); দীর্ঘনিকায়, প্রথম খণ্ড।

- ୭୭

- ৪৬। জাতক নিদান (অনুবাদ), ধর্মপাল ভিক্ষু, বৌদ্ধ ধর্মাকুর বিহার, কলিকাতা, ১৯৬২সং, পৃঃ ১২৮।
- ৪৭। মহাপরিনির্বাণ-সূত্র, পঞ্চম অধ্যায়।
- ৪৮। ধর্মপাদ-অর্থকথা, অঙ্গুত্তর-নিকায়-অর্থকথা, অপ্রদান-অর্থকথা, থেরগাথা-অর্থকথা।
- ৪৯। মধ্যমনিকায়; মধ্যমনিকায়-অর্থকথা; মিলিন্দপ্রশ্ন।
- ৫০। ধর্মপদ-অর্থকথা।
- ৫১। প্রাগুক্ত।
- ৫২। বৌদ্ধগণ পরম্পরা অনুসারে বুদ্ধকে উদ্দেশ্য করে পূজা করার সময় দিব্য আভ্যামণ্ডিত বুদ্ধের সেই রূপকে মনন করতে করতে বলা হয় ‘নিরোধ-সমাপত্তিতে উট্টাহিত্তা বিয় নিসিন্নস্ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্ ইমিনা পুপফেন, পদীপেন, আহাৰেণ পূজেমি’ অর্থাৎ নিরোধ-সমাপত্তি-ধ্যান থেকে উত্তিত ভগবান অরহত সম্যক্ সম্বুদ্ধকে এ পুষ্প, দীপ, আহার দিয়ে পূজা করছি।
- ৫৩। জাতক; অঙ্গুত্তরনিকায় অর্থকথা।
- ৫৪। অনেক ক্ষেত্রে মূর্তি ও লিঙ্গকে সমানার্থক বলে মনে করা হয়। কিন্তু বস্তুত তা নয়। মূর্তি বলতে কোন স্মরণীয় ব্যক্তি বা প্রাণীর অবিকল মূর্তি বা প্রতিকৃতি। কিন্তু ‘লিঙ্গ’ বলতে বোঝায় ঐ ব্যক্তি বা প্রাণীকে স্মরণ করার প্রতীক মাত্র। এ প্রসঙ্গে শিবমূর্তি ও শিবলিঙ্গ তুলনীয় হতে পারে। এখানে বুদ্ধলিঙ্গ বলতে বোধিবৃক্ষ, বজ্রাসন, বুদ্ধের পদচিহ্ন আদিকে বোঝা যেতে পারে।
- ৫৫। একরূপ অপর একটি বিবরণ পাওয়া যায় চীনা পরিব্রাজক উয়ান চোয়াঙ-এর বিবরণীতে এবং তা বর্ণিত রয়েছে দিব্যাবদান গ্রন্থে। তাতে বলা হয়েছে বুদ্ধ যখন তাঁর মায়ের নিকট অভিধর্ম ব্যাখ্যা করার জন্য তাবতিংস দেবলোকে উপনীত হন, তখন তাঁর শিষ্য মৌদগল্যায়ন কৌশল্যের রাজা উদয়ের অনুরোধে বুদ্ধের একটি প্রতিবিম্ব আননের জন্য একজন শিল্পীকে তথায় পাঠান। সেখান থেকে শিল্পী বুদ্ধের সাদৃশ্য; দেখে আসেন এবং চন্দন-কাঠের এক অনুরূপ মূর্তি তৈরি করেন (এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট, পৃঃ ৬৮০)।
- ৫৬। এ বুদ্ধমূর্তিকে বলা হয় “নিমিত্ত বুদ্ধ” এবং এ মূর্তিটি তাবতিংস ভবনে দেবরাজ ইন্দ্রের আসনে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। নিমিত্ত বুদ্ধমূর্তি রেখে বুদ্ধ ভিক্ষাম্ন গ্রহণের জন্য অনাবতপ্ত হৃদে অবতরণ করতেন।
- ৫৭। বিনয় পিটক।
- ৫৮। এ চার প্রকার অবস্থাকে বলা হয় ঈর্ষাপথ এবং ঈর্ষাপথ বিদর্শন স্মৃতিসাধনাকারী যোগীর প্রথনা অবলম্বন (মহাস্মৃতিপ্রস্থান সূত্র, দীর্ঘনিকায়)।

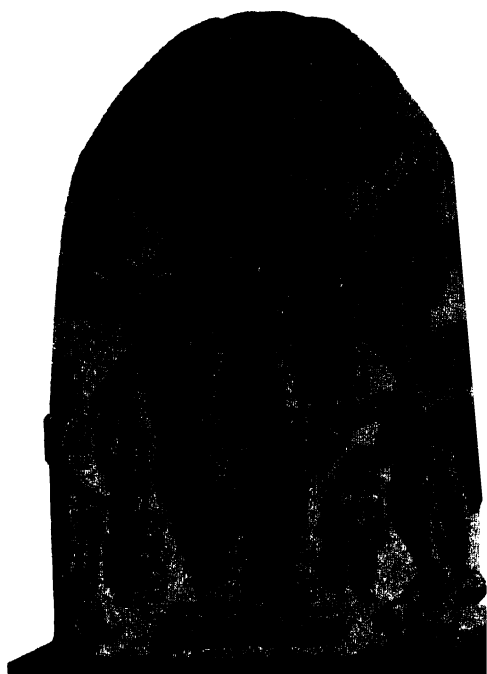
- ৫৯। এ শিল্প দু'টি গড়ে উঠে ভারতে কুষাণ রাজবংশের রাজত্বকালে এবং কুষাণ সম্রাট গণের রাজত্বকাল ছিলো আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষার্ধ থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত। এ রাজবংশের সম্রাটগণ ছিলেন বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করেই উক্ত শিল্প দু'টি গড়ে উঠে। তখন মহাযান বৌদ্ধধর্মের মতবাদ অনুসারে বুদ্ধমূর্তির উপসনা ব্যাপকভাবে শুরু হয়। বলাবাহুল্য যে গাঙ্কার শিল্পরীতি অনুসরণে অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয় এবং এ শিল্পরীতি মথুরা ও অমরাবতী শিল্পকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।
- ৬০। According to Mathew T Captain, Tibetan Assimilation of Buddhism, Conversion, Constation and Memory, Oxford, 2000, p. 211.
- ৬১ বৈরোচন (মধ্য), অশ্ফোভ্য (পূর্ব) রত্নসম্ভব (দক্ষিণ), অমিতাভ (পশ্চিম) এবং অমোঘসিদ্ধি (উত্তর)।
- ৬২। রমনীযানি অরঞ্ঞানি যথ না রমতি জানো,
বীতরাগ রমিস্সন্তি তে কামগবেসিনো। ধর্মপদ-৯৯/১০।



মহামায়ার স্বপ্ন, ভারত।



সিদ্ধার্থের জন্ম, গান্ধার।



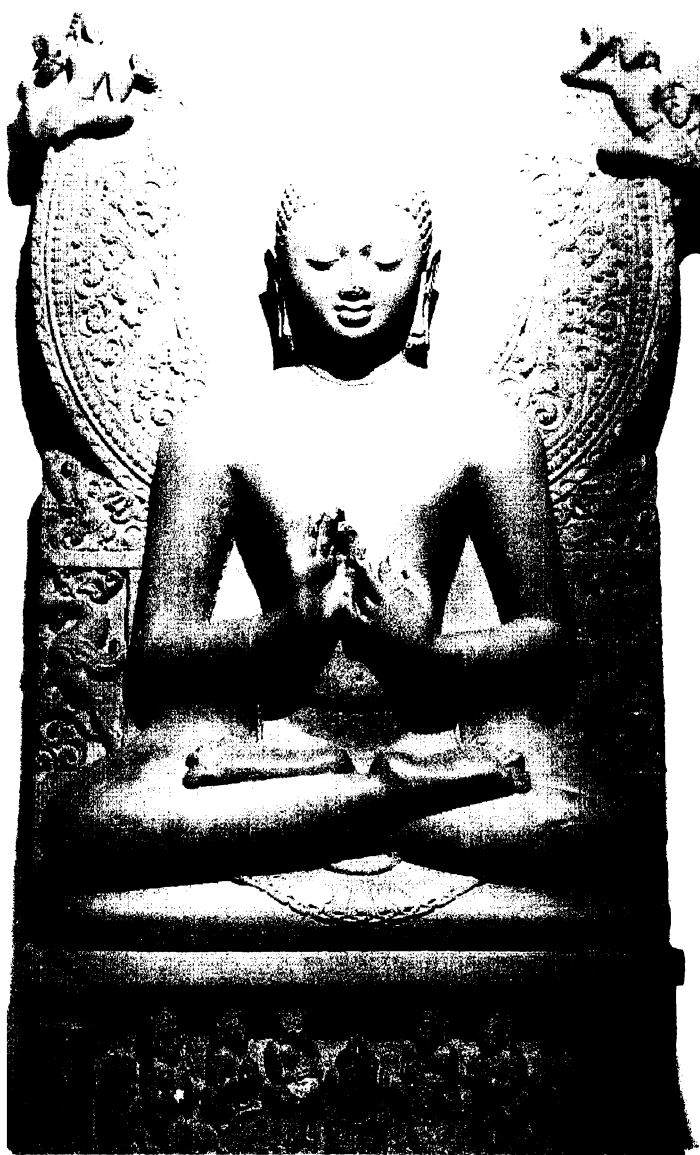
সিদ্ধার্থের জন্ম, নালন্দা।



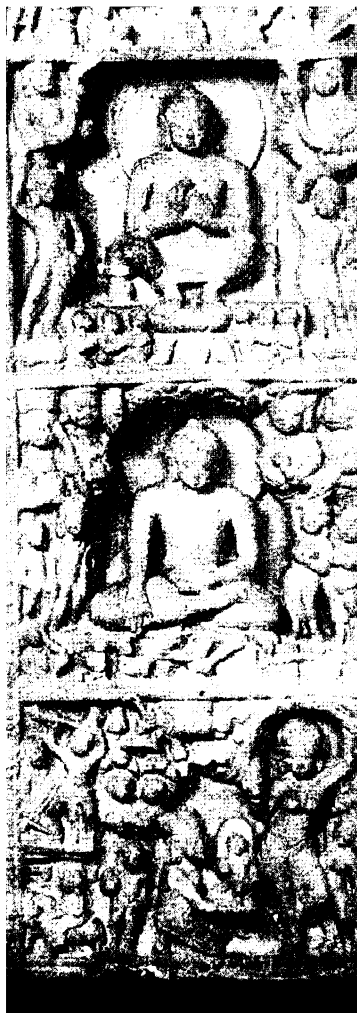
বোধিসত্ত্বের কচ্ছসাদন, গান্ধার।



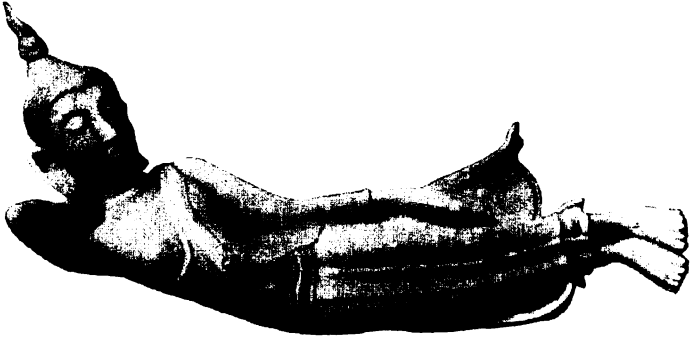
ধ্যানমুদ্রায় বুদ্ধ, গান্ধার।



ধর্মচক্র / বিতর্ক মুদ্রা, সারনাথ।



বুদ্ধের জীবনী, সারনাথ।



মহানিৰ্বাণে বুদ্ধ, সুখোথাই।



ভূমিস্পৰ্শ মুদ্রায় বুদ্ধ, ব্যাঙ্কক।



পদপ্রক্ষেপনে বুদ্ধ, সুখোথাই স্টাইল।